ষোড়শ অধ্যায়

ভূমি ও ভূমিসংস্কার

পটভূমিকা

আধুনিক মুর্শিদাবাদ জেলার ভূমিস্বত্ব ও ভূমি রাজস্ব ব্যবস্থার ধারাবাহিক ইতিহাসের সন্ধানে খুব বেশি পিছনে গেলে কতকগুলি অস্পষ্ট রেখাচিত্র পাওয়া যাবে মাত্র। যে সমস্ত প্রাচীন গ্রন্থ এ বিষয়ে ইতিহাসের আকর, তার একটিও বঙ্গভূমিতে রচিত নয়। কাজেই মুর্শিদাবাদ সম্বন্ধে আলাদা বিবরণের কোনও প্র(ই ওঠে না। খ্রীষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দী পর্যন্ত যে সব বিবরণ পাওয়া যায়, তা থেকে কোনও বিশেষ সাম্রাজ্য বা পূর্বভারত বা গৌড়বঙ্গের তৎকালীন ভূমি ব্যবস্থার কিছু আংশিক বিবরণ পাওয়া যেতে পারে। মুর্শিদাবাদ জেলা সম্বন্ধে তার কোনও স্থানীয় প্রাসঙ্গিকতা নেই। সেই বৃহৎ পটভূমিকায় এই জেলাকে আলাদা করে চিহ্নি(ত করা যাবে না। এইটুকু অনুমান করা যেতে পারে, নিম্নগাঙ্গেয় সমভূমির অন্যত্র যে ব্যবস্থা ছিল, এই জেলাতেও প্রধানত তাই ছিল।

তা ছাড়া ঐতিহাসিক যুগে ষোড়শ শতাব্দীর পূর্বে বর্তমান মুর্শিদাবাদ জেলা খুব বেশি সময়ের জন্য প্রত্য(ভাবে কোনও দৃঢ় কেন্দ্রীয় রাজনৈতিক ব্যবস্থার অধীন ছিল না। গুপ্তযুগে, শশাঙ্কের রাজত্বকালে, পাল ও সেন যুগে এবং ইলিয়াস শাহী ও হুসেন শাহী সুলতানদের শাসনকালের কিছু অংশই এই ব্যতিত্র(মী সময়। এই কারণে প্রাচীন আকর গ্রন্থগুলির স্থানীয় তাৎপর্য মুর্শিদাবাদ জেলা সম্বন্ধে সামান্যই। স্থানীয় সামন্ত শাসকেরা কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা বা বিধি অনুসরণ করতেন একথা নিশ্চিত করে বলা যাবে না। মানসিংহের বঙ্গ অভিযান থেকেই ধীরে ধীরে মুর্শিদাবাদের স্বতন্ত্র ইতিহাস গড়ে উঠেছে। তার পূর্বের বিবরণ বৃহত্তর পটভূমিকার, এবং সং(প্ত চুম্বকে প্রকাশ করলেই যথেষ্ট হবে।

ঋকবেদে পৃথক সীমানাযুক্ত(কৃষিজমিকে '(ে ত্র' বলা হয়েছে। একটা (ে ত্র অন্য (ে ত্র থেকে কিছুটা তফাতে থাকলে বিভাজন - ভূমিটুকু আলাদা 'খিল্য' নামে পরিচিত হ'ত। প্রতিটি (ে ত্রের সীমানার মধ্যে থাকত হাল-জমি বা উর্বরা। '(ে ত্রপতি' হতেন জমির ব্যক্তি(গত মালিক। জনবসতির নাম ছিল 'গ্রাম'। গ্রাম ছাড়া ছিল 'অরণ্য'। গ্রামের গৃহস্থদের নিয়ে এক একটি 'গৃহ' বা 'কুল' সংগঠন হ'ত। 'কুলপ' হতেন কুলের কর্তা।

পরবর্তীকালে বর্ণাশ্রম ধর্মের প্রতিষ্ঠার সময় দেখা গেল (ে ত্রপাল বা (ে ত্রপতিরাই মুখ্যত (ত্রিয় বর্ণ হয়ে দাঁড়ালেন। আর যারা তাঁদের বশ্যতা মেনে 'বলি' অর্থাৎ জমির খাজনা উশুল দিয়ে গ্রামস্থ জমি ভোগ করত, তাঁদের পরিচয় হ'ল বৈশ্য।

মহাকাব্যের যুগেও বৈদিক সমাজের পরিবার ভিত্তিক জমির মালিকানা বজায় ছিল। বৌদ্ধযুগের জাতক কাহিনীগুলিও সম্রাট অশোকের শিলালিপিও পরিবারগত যৌথ মালিকানার অস্তিত্বের কথা বলে। পরিবারের কর্তা ছিলেন জমির মালিক এবং সমস্ত স্বত্বই তাঁর উত্তরাধিকারীদের ওপরে বর্তাত। রাজা ছিলেন সার্বভৌম অর্থাৎ সর্বভূমির মালিক। কিন্তু সেটি রাজার রাজনৈতিক অধিকার, তা কোনোভাবে প্রজার ব্যক্তি(গত অধিকারকে খর্ব করত না।

ধর্ম সূত্রগুলির সা(্য অনুযায়ী উৎপন্ন শস্যের এক-দশমাংশ থেকে এক-ষষ্ঠাংশ ছিল রাজার প্রাপ্য । এই তাত্ত্বিক নীতি কতটা পালিত হ'ত, সন্দেহ আছে। এ ধরণের রাজস্ব নির্ধারণ ব্যবস্থা খুব দীর্ঘসময় ধরে ছিল বলে জানা নেই। তা ছাড়া এ-রকম ব্যবস্থায় রাজা ও কৃষকের মধ্যে কোনও মধ্যস্বত্বভোগী থাকার অবকাশ নেই। অথচ ব্রাহ্মণকে (যাঁরা ঐতিহ্যগতভাবে অ-চাষী) ভূমিদানের বহু প্রমাণ্য দলিল পাওয়া যায়। এঁরা জমির চাষের ভার অপরকে দিয়ে মধ্যস্বত্ব উপভোগ করতেন মনে করাই স্বাভাবিক। বপ্পঘোষবাট ভূমিদানপত্রের কথা এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য। এল.ডি. বার্নেটের মতে বপ্পঘোষবাট গ্রামটি এখনকার কান্দী মহকুমার অন্তর্গত । দানপত্র অনুযায়ী সপ্তম শতাব্দীতে কর্ণসুবর্ণের রাজা জয়নাগের সামন্ত নারায়ণভদ্র গ্রামটি দান করেছিলেন ভট্টব্রহ্মবীরস্বামী নামে এক ব্রাহ্মণকে। মধ্যস্বত্ব ভোগীর অস্তিত্ব ছাড়া ও এধরণের ভূমিদান পত্র গুলি দেখে মনে হয় হিন্দু রাজা ও সামন্তরা গ্রামে জমিদান করে ব্রাহ্মণ পরিবারগুলিকে বসাতেন এবং তারা ঐ জমি নিষ্কর ভূমি হিসাবে ব্যবহার করতেন, অনেকটা পরবর্তীকালের দেবোত্তর সম্পত্তির মত। নানাসূত্র থেকে জানা যায়, অন্তত বেশ কিছু মালিকের হস্তান্তরযোগ্য অধিকার ছিল। বেদ প্রসূত যে ভূমিব্যবস্থা সমগ্র ভারতে প্রাচীন যুগে ছড়িয়ে পড়েছিল, তা খ্রীষ্টীয় তৃতীয় শতক পর্যন্ত এক অবিকৃত অবস্থায় গৌড়বঙ্গেও অনুসৃত হয়।

এই সময়েই এখানে ভূস্বামী ব্যবস্থার (landlordism) উদ্ভব ঘটে। জমির উপর মালিকানা তথা মালিকানা বহির্ভূত নানা সূত্রে কৃষি শ্রমজীবি (যা আজকের বর্গাদারী প্রথার সঙ্গে তুলনীয়) বেগার শ্রমিক ব্যবস্থা গ্রামাঞ্চলে যথারীতি কায়েম হয়। রাষ্ট্রের ওপরে ছিলেন রাজা। তিনি বহিঃশত্রুর আত্র(মণ থেকে রাষ্ট্রকে র(া করার জন্য গ্রাম ও নগর জীবনের উন্নয়ন ও প্রশাসনের জন্য, ভূমিব্যবস্থায় নির্ভরশীল প্রজাদের শান্তিপূর্ণ নিরবছিন্ন কর্ষণ ব্যবস্থা ও কৃষি-উৎপন্নের বিকাশকে সুশৃঙ্খল ভাবে নিয়ন্ত্রণ করতেন। আর এ কাজের

জন্য ভূমিতে নির্ভরশীল সকল শ্রেণীর প্রজাকে রাজকর বা রাজস্ব দিতে হ'ত। মূলত, ভূস্বামী শ্রেণীর মধ্যে ওপরে অবস্থিত 'রাজস্ব সংগ্রাহক' একটি শ্রেণীর (যা জেলাঞ্চলে 'সামন্ত প্রভু') উদ্ভব হয়। মেগাস্থিনিস, হিউয়েন সাঙ এবং কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র থেকে জানা যায় যে, কম করে ১০০ অনধিক ৫০০ পরিবার নিয়ে গ্রাম গঠিত ছিল। এই গ্রামের প্রধান ভূস্বামী 'গ্রামীণ' হিসাবে চিহ্নিত ছিলেন। প্রতি গ্রামে গ্রামে জমি জায়গার হিসাব নিকাশ, ভূ-সম্পত্তির নিবন্ধীকরণ (যা এখনকার স্বত্বলিপি জাতীয়) ইত্যাদি কাজে নিযুক্ত ছিলেন 'গোপ' নামে একশ্রেণীর রাজকর্মচারী। এই 'গোপ' নামীয় রাজকর্মচারী গ্রামের ভূ-সম্পদের ব্যক্তিগত মালিকানার দখলগত হিসাব, গ্রামের সীমানা, কৃষি-অকৃষি জমি, সমতলভূমি, জলাশয়, বাগান, বন-জঙ্গল, মন্দির উপাসনাস্থল, সেচব্যবস্থা, শ্মশান, উপসল্য ইত্যাদি নিবন্ধী বা তমসুকে লিখে রাখতেন। প্রত্যেক গৃহের যুবক, বৃদ্ধ এবং তাদের চরিত্র ও জীবিকা, আয়-ব্যয় সবেরই হিসাব এতে রাখা হ'ত। কয়েকটি গ্রাম নিয়ে একটি 'মণ্ডল' গঠিত ছিল এবং এই মণ্ডলের প্রধান ছিলেন 'মণ্ডল' নামের সর্ববৃহৎ ভূ-স্বামী।

ভূমিতে উৎপন্ন শস্যের ১/৮ (এক অষ্টমাংশ) রাজভাগ হিসাবে বা কর হিসাবে রাষ্ট্র তথা রাজাকে প্রজাগণ দিতেন। শশাঙ্কের সময় প্রচলিত প্রজাগণ কর্তৃক দেয় রাজস্ব ও করের বিভিন্ন নাম বা রকমফের ল্য করার মত। প্রজার দখলীসত্ত্ব বিশিষ্ট জমির করের নাম ছিল 'উদ্রঙ্গ'। দখলীস্বত্বশূন্য জমির উপর দেয় কর 'উপঠিক' নামে অভিহিত। পতিত জমির উপর দেয় কর 'ভাট' এবং উৎপন্ন শস্যের উপর আদায়কৃত কর 'ধান্য' নামে পরিচিত। পূর্বেই বলা হয়েছে জমিতে উৎপন্ন শস্যের এক-অষ্টমাংশ ভাগ রাজা ও রাষ্ট্রের প্রাপ্য - আবার এই রাজস্বের চারটি ভাগ ছিল -- 'ভাগ' বা কৃষিজাত শস্যের ১/৮ ভাগ('ভোগ' বা ফল, ফুল, কাঠ ইত্যাদি যা রাজাকে ব্যক্তিগত ভোগের জন্য প্রজাকে দিতে হ'ত('কর' (ক. মুদ্রাকর, খ.আপৎকালীন দেয় কর এবং গ. লাভের উপর দেয় কর) এবং 'হিরণ্য' (শস্যের বদলে হিরণ্য)। গৌড়বঙ্গ তথা মুর্শিদাবাদ অঞ্চলে সেন ও পালবংশের আমলে ভূমিরাজস্ব মুদ্রায় দিতে হ'ত তার প্রমাণ পাওয়া যায়।

এই আমলের প্রায় প্রতিটি লিপি বা প্রস্তরলেখে জমির বার্ষিক আয় প্রচলিত মুদ্রায় সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্মভাবে উল্লিখিত আছে। আবাদযোগ্য জমির উৎপাদিত শস্যের উপর আয়ের পরিমাণ নির্ভর করত এবং ভূমিকর বা ভূমিরাজস্ব ব্যবস্থা নির্ধারিত হয়ে থাকত সেই অনুযায়ী। এ ছাড়া বেশ কিছু প্রস্তর- লেখে জমির বিভিন্ন শ্রেণীর উল্লেখ ল্য করবার মত। সমাজর(ক, পালক রাজাই ছিলেন ভূ-সম্পত্তির মালিক। ভূমিতে কর্ষণকারী সাধারণ অধিবাসীরা উৎপন্ন শস্যের ১/৬ অংশ কর দিয়ে পাল আমলে জমি ভোগ দখল করতেন। এই কর যিনি আদায় করতেন তাকে 'ষষ্ঠাধিকৃত' বলা হ'ত।

রাজার অনুমতি নিয়ে জমি বা ভূ-সম্পত্তির হস্তান্তর ঘটানো যেত। হস্তান্তরের সময় রাজকর্মচারী আমলারা জমির সীমা মেপে চিহ্নিত করে দিতেন। 'ত্রিমোহিনী' এবং 'পাঁচথুপিতে' প্রাপ্ত প্রস্তরলেখে দেখা যায়, জমি মাপের জন্য 'নল' ছিল 'মানদণ্ড'। বস্তুত, 'নল' এবং 'দড়ি' দিয়ে জমি মাপা হ'ত -- দড়িকে 'রজ্জু'ও বলা হ'ত। এক 'রজ্জু' সমান ছিল ১০ দণ্ড (লাঠি) বা ৪০ হাত, আবার ১ হাত সমান ৫৪ আঙুল। এই জমি পরিমাপের জন্য যে কর রাজা সংগ্রহ করতেন, তাকেও 'রজ্জু' বলা হ'ত। হিন্দু যুগে গুপ্ত-পাল-সেন আমলে মুর্শিদাবাদ অঞ্চলে ভূমি বিষয়ক সমস্ত কাজকর্ম দেখতেন সাত শ্রেণীর রাজকর্মচারী - সমাহর্তা, স্থানিক, নিবন্ধক, গোপ, ষষ্ঠাধিকৃত, হস্তপাল (যারা গ্রামীণ জমির খতিয়ান তৈরী করতেন) এবং ন্যায় করণিক (যিনি জমির পরিদর্শক ও মাপজোপের প্রাথমিক হিসাবর(ক)। প্রত্যেক গ্রামে একজন করে গ্রামাধ্য(থাকতেন। ১০টি গ্রাম নিয়ে গঠিত 'মণ্ডল'কে বলা হ'ত 'সমগ্রহণ'।

এই গ্রামীণ ভূমিব্যবস্থা পরিচালনার জন্য সেকালে নিযুক্ত রাজকর্মচারীদের রাজন্যবর্গ মাস মাইনের পরিবর্তে 'নিষ্কর জমি' ভোগ-দখল করবার জন্য প্রদান করতেন। প্রাচীন মুর্শিদাবাদ অঞ্চলের ভূমি ব্যবস্থায় দেখা যাচ্ছে যে, ১টি গ্রামের গ্রামাধ্য(পেতেন এক কুল নিষ্কর জমি যেখানে বারটি ষাঁড় স্বচ্ছন্দে চাষ করতে পারে। দশটি গ্রামের 'মণ্ডলাধিপতি' পেতেন তিনকুল নিষ্কর জমি এবং কুড়িটি গ্রামের রাজস্ব কর্মচারী পেতেন পাঁচ কুল নিষ্কর জমি এবং একশ গ্রামের রাজস্ব সংগ্রাহক রাজকর্মচারী পেতেন পাঁচটি গোটা গ্রামের জমি তাঁর বেতন হিসাবে। ৫০০ গ্রামের রাজকর্মচারী পেতেন একটি পুরো 'নগরের' অধিকার। ৫০০ পরিবার অধ্যুষিত অঞ্চল 'গ্রাম' নামে অভিহিত ছিল। এইসব প্রাচীন গ্রামগুলোর মধ্যে বাজারসাউ (বজ্রাসন?), বারকোণা, মুনিয়াডিহি, পাঁচথুপি, মহলন্দি, অমৃতকুণ্ড, সাগরদীঘি, ত্রিমোহিনী, খড়গ্রাম, নগর, পাঁচগ্রাম(পঞ্চগ্রাম?), ইন্দ্রাণী, নবগ্রাম, শক্তি(পুর, ভগীরথপুর, কালিকাপুর, ভগবানগোলা, রাণীনগর, ব্রাহ্মণগ্রাম, মণিগ্রাম, চন্দনবাটী ইত্যাদি নামগুলি উল্লেখযোগ্য।

বস্তুত সপ্তম থেকে ত্রয়োদশ শতাব্দী পর্যন্ত কর্ণসুবর্ণ ও গৌড়কে কেন্দ্র করে যে শক্তি(শালী রাষ্ট্রকর্তৃত্ব জেলাঞ্চলে প্রতিষ্ঠিত হয় তার ফলে সামন্ত শ্রেণীর আয়তন বৃদ্ধি পায়। নীচতলা থেকে গ্রাম ও ভূমি কেন্দ্রিক একটি শক্তি(র উদ্ভব ঘটে যার উপর অর্পিত হয়েছিল জমির প্রাথমিক উৎপাদকদের কাছ থেকে রাজস্ব সংগ্রহের ভার এবং রাষ্ট্রযন্ত্রকে পরিপুষ্ট করার দায়িত্ব। গৌড়বঙ্গের এই ভূমিব্যবস্থায় মুর্শিদাবাদের জনজীবনে কৃষি ও কুটীর শিল্পে সুদূর প্রসারী পরিবর্তন এনেছিল। ফলে জেলাঞ্চলের জনগণের মধ্যে জাত বৈষম্য ও শোষণ

প্রাতিষ্ঠানিক রূপ পেয়েছিল। পাল যুগে সাধারণ মানুষ সীমাহীন বঞ্চনা ও সামন্ত প্রভুদের নির্যাতনের বি(দ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে। এই বিদ্রোহের (যা ইতিহাসে কৈবর্ত বিদ্রোহ নামে পরিচিত) যুগ্মনায়ক (১) দিব্য ও (২) ভীম। 'দিব্য' ও 'ভীম' একদা অত্যাচারী রাজা মহীপালকে হত্যা করলে, মহীপালের ভাই রামপাল রাষ্ট্র (মতা পুনর্দখলের জন্য মগধ, দ(িণ রাঢ় বা রাঢ়ের যে সকল ব্রাহ্মণ প্রধান সমাজের সমর্থক সামন্তপ্রভু বা নৃপতিদের একত্রিত করেছিলেন তাদের মধ্যে গু(ত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছিল মুর্শিদাবাদ জেলাঞ্চলের (ুদ্র বৃহৎ সামন্তবৃন্দ।

প্রাচীনযুগে রাজনৈতিক (মতা বা শ্রেণী পরম্পরা গত (hierarchical structure) কাঠামোতে বিন্যস্ত ছিল। কেন্দ্রীয় শক্তি(অর্থাৎ রাজা বা সম্রাট রাজধানী সন্নিহিত অঞ্চল কিছু রাজ কর্মচারীর মাধ্যমে সরাসরি শাসন করতেন। রাজধানী থেকে দূরবর্তী অঞ্চলগুলি শাসিত হ'ত রাজকর্মচারী অথবা স্থানীয় শাসক অথবা সামন্তদের মাধ্যমে। যেমন রাজা জয়নাগের সময়ে নারায়ণ ভদ্র নামে এক সামন্তের উল্লেখ মুর্শিদাবাদ প্রসঙ্গে পাওয়া যাচ্ছে। রাজা বা সম্রাট যদি শক্তি(শালী হতেন এবং সামন্ত শাসকের অধীন অঞ্চল যদি রাজধানীর সমীপবর্তী হ'ত, তবে সেই সামন্ত নিয়মিত রাজকর দিতেন। কিন্তু কেন্দ্রীয় রাজশক্তি(দূরবর্তী হলে সামন্তরা প্রায় স্বাধীন রাজার মত চলতেন। রাজকরের নির্দিষ্ট কোনও হার তাঁরা মানতেন না, নিয়মিত করও দিতেন না। পালযুগের এই রকম স্থানীয় প্রধান ও সামন্তদের মধ্যে মুর্শিদাবাদ ও সন্নিহিত অঞ্চলের ব্যাঘ্রতটীর মন্ডলাধিপতি বলবর্মন, ঢেক্করীর মহামান্ডলিক ঈ(রঘোষ, নিদ্রাবলীর বিজয় রাজ ও কজঙ্গল মন্ডলের নরসিংহার্জুনির নাম পাওয়া পায়। পালরাজাদের সার্বভৌমত্ব মেনে নিয়মিত করপ্রদান করা ও প্রয়োজনে রাজাকে সৈন্যসাহায্য করতেন এরা। ফলে তাদের শাসনাধীন অঞ্চলে কৃষকেরা সার্বভৌম রাজাকে কখনও কর দিতনা, তারা কর দিত সামন্ত রাজাদের। আর এই সামন্ত রাজারা কৃষকদের কাছ থেকে যে হারে কর আদায় করতেন তার সাথে রাজশক্তি(নির্ধারিত করহারের কোনও সম্পর্ক থাকত না।

হিন্দু শাসকদের মত বাংলার তুর্কী আফগান সুলতানরাও সুফী-সন্ত মুসলিম ধর্ম প্রচারক ও মুসলমান ধর্ম শি(কদের নিষ্কর জমি দিতেন। একে বলা হত আয়মা। গৌড়ের ইলিয়াস শাহ্ ও হুসেন শাহী সুলতানেরা ফতেসিং পরগণার মনসুরপুর, সন্তোষপুর ও হরনন্দপুর গ্রামে খোন্দকার বা সুন্নী আসরাফদের ভূমিদান কর বসিয়েছিলেন এমন তথ্য পাওয়া যায়।

মোগল আমলে সম্রাটেরা এইসব দান যে কোনও সময়ে নাকচ করে জমি ফেরৎ নিতে পারতেন। আয়মা জমি পরিবর্তিত হ'ত খালিসা বা খাস জমিতে। আকবরের আমলে ফতে সিং পরগনার খোন্দকারদের দান করা অধিকাংশ আয়মা জমি ফিরিয়ে নেওয়া হয়। আবার শাহজাহানের ও তার পুত্র শাহ্ সুজার সময় নূতন ভূমিদান পত্রে তা নিষ্কর ভূমি রূপে দান করা হয়। প্রসঙ্গত মোগল আমলে এধরণের নিষ্কর ভূমিকে বলা হত মাদাদ-উল্-মাস। শাহ্ সুজা সালারে কিছু মাদাদ-উল্-মাস বা নিষ্কর বাস্তুভূমি ধর্মপ্রচারকদের দান করেছিলেন ১০৬৬ হিজরী সালে। মীরজুমলা ও শায়েস্তা খাঁও লাখেরাজ বা নিষ্কর ভূমির বন্দোবস্ত করেছিলেন। সুলতানী আমলেই জায়গীরদারী প্রথার চল হয়। কিছু অভিজাত ব্যক্তি(কেন্দ্রীয় রাজশক্তি(কে সামরিক সাহায্য (এবং হয়ত অনিয়মিত উপঢৌকন) দেওয়ার বিনিময়ে বিস্তীর্ণ এলাকার জায়গীরদারী পেতেন এবং খাজনাভোগী হতেন। না হলেও কার্যত জায়গীরদারী স্বত্ব উত্তরাধিকারত্র(মে বর্তাত। এছাড়া অনেক অঞ্চলেই স্থানীয় শাসকেরাই নিজেদের নিয়মে খাজনা আদায় করতেন, কেন্দ্রীয় রাজ শক্তি(কে অনিয়মিত অর্থ দিতেন এবং কেন্দ্রীয় রাজশক্তি(বিরূপ না হওয়া পর্যন্ত স্বশাসনে অবিচল থাকতেন। ফতেসিং পরগণা (মোটামুটিভাবে বর্তমান মুর্শিদাবাদ জেলায় ভাগীরথী নদীর পশ্চিমে অবস্থিত অংশ) ফতেসিং নামে এরকম একজন হাড়িজাতীয় ব্যক্তি(র শাসনে ছিল। মানসিংহের অভিযানের সময়ে মোগল শক্তি(র বিরোধিতা করে তিনি সবিতা রায় নামে মানসিংহের এক ঝিঝোতিয়া ব্রাহ্মণ সেনাপতির হাতে পরাস্ত হন। পুরস্কার হিসাবে সবিতা রায় পরগণার একটি অংশের জমিদারি ও অন্য অংশের জায়গীর পান। জায়গীরদারী এলাকার আইনশৃঙ্খলা র(া ও প্রশাসন ছিল জায়গীরদার দের দায়িত্ব। হুসেন শাহর পিতা সৈদ আসরাফ-আল্-হুসেইনি আরব দেশ থেকে এসে সম্ভবতঃ এইরকম জায়গীরদারী লাভ করে সাগরদীঘি থানার একানি-চাঁদপাড়া গ্রামে বসবাস শু(করেছিলেন।

এখানে জমিদারী প্রথা সম্বন্ধে সং(েপে কিছু বলা চলে। হিন্দু যুগে জমিদার অর্থাৎ স্বত্বভোগী ভূস্বামী শ্রেণীর অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া শক্ত(। মনুসংহিতায় রাজাকে 'ভূপতি' বলা হয়েছে বটে কিন্তু সেই সঙ্গে রাজার রাজনৈতিক (মতাকে রাজস্ব আদায়ে সীমিত করে দেখানো হয়েছে।

প্রধানত রাজস্ব আদায়ের সুবিধার্থে এবং রাজদরবারে অনুগ্রহ ভাজন বি(োসী গোষ্ঠী তৈরী করার জন্য মুসলমান যুগে সর্বপ্রধম স্বত্বভোগী ভূস্বামী শ্রেণীর জন্ম হয়। জায়গীরদাররা আসলে এই নতুন জমিদার শ্রেণী। পাশাপাশি যে সব হিন্দু রাজা মুসলমান শাসকের বশ্যতা স্বীকার করে নিয়মিত রাজস্ব বা পেশকাশ দিতেন তারা রইলেন পেশকাশী জমিদার হয়ে। যে সব জমিদার স্বাধীন হিন্দু রাজাদের মত নির্দিষ্ট হারে পেশকাশ দিতেন না তাঁদের জন্য অন্য ব্যবস্থা ছিল। তাদের ভূমির উৎপন্ন ফসলের পরিমাণ রাজস্ব কর্মচারীর হিসাবের খাতা বা 'মাল ওয়াজিব' এ নথিবদ্ধ করা হ'ত। এদের

খাজনার হার প্রশাসন ঠিক করত। এদের বলা হ'ত মাল ওয়াজির জমিদার।

জায়গীরদার ও জমিদার ছাড়া ইজারাদার নামে আরেক অভিনব মধ্যস্বত্বভোগী শ্রেণী এ সময় সৃষ্টি হয়। ইজারা চুক্তি(তে সর্বোচ্চ পরিমাণ রাজস্ব আদায়ের শর্তে নিযুক্ত(হ'ত ইজারাদার। রায়তদের উপর নির্যাতন করে জমির খাজনা আদায় করতে এরা ওস্তাদ ছিল। এদের ভয়ে পেশকাশী জমিদাররাও নির্দিষ্ট পেশকাশ রাজকোষে জমা করতে ভুল করত না। জমিদারেরা ছিলেন মূলত রাজস্ব আদায়কারী। তাঁরা পারিশ্রমিক হিসাবে রাজস্বের একটি অংশ রেখে দিতে পারতেন। কিন্তু কার্যত জমিদারীও বংশানুক্র(মিক এবং হস্তান্তরযোগ্য হয়ে যায় এবং জমিদারেরা কিছু প্রশাসনিক (মতা অর্জন করেন। তাঁদের রাজস্ব আদায়ের পদ্ধতিও স্থানীয় প্রথা-অনুযায়ীই হ'ত। কেন্দ্রীয় শাসকেরা কদাচিৎ হস্ত(প করতেন।

সম্রাট আকবরের রাজস্বমন্ত্রী টোডরমলই প্রথম ১৫৮২ খ্রীষ্টাব্দে তৎকালীন বাংলা সুবার ভূমিব্যবস্থা এবং রাজস্বের একটি বিধিবদ্ধ ব্যবস্থা করেন। কৃষি জমি চারটি শ্রেণীতে ভাগ হয়। প্রতিটি শ্রেণীর জন্য ঊনিশ বৎসরের গড় উৎপাদন এবং ফসলের গড় মূল্যের ভিত্তিতে উৎপাদনের এক-চতুর্থাংশের অর্থমূল্য খাজনা হিসাবে ধার্য হয়। এই রাজস্বের দাবির নাম দেওয়া হল ঔসলি-তুমারি জমা। সুবা ভাগ হয় ঊনিশটি সরকারে। আবার প্রতিটি সরকার ভাগ হয় কয়েকটি পরগণায়। পরগণা কয়েকটি মহলে ভাগ হয়। প্রতিটি পরগণার জন্য জমিদার নামে একজন রাজস্ব আদায়কারী নিযুক্ত(হন। এদের কিছু প্রশাসনিক ও ফৌজদারি (মতা দেওয়া হয়। পারিশ্রমিক হিসাবে এরা কিছু নিষ্কর জমি এবং রাজস্বের শতকরা পাঁচভাগ পর্যন্ত পেতেন। ১৫৯৪ - ১৫৯৮ খ্রীষ্টাব্দে এবং ১৬০১ - ১৬০৩ খ্রীষ্টাব্দে রাজা মানসিংহের আমলে এই প্রথাগুলি কার্যকর হয়।

ইরফান হাবিব, তাপস রায়চৌধুরী, আব্দুল করিম প্রমুখ ঐতিহাসিকেরা সমসাময়িক বিবরণ বি(েষণ করে এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন, যে এই তাত্ত্বিক কাঠামো এখনও সম্পূর্ণভাবে রূপায়িত হয়নি। জমিদারদের অধিকার যে এই কাঠামো দ্বারা সীমায়িত থাকেনি, সেকথা আগে বলা হয়েছে। বীরভূমের রাজা, বিষ্ণুপুরের রাজা ইত্যাদি স্থানীয় (ত্রপদের অধীন এলাকা ঔসলি-তুমারি জমাতে ওঠেইনি, বরং বাদশাহকে পেশকাশ নামক অনিয়মিত করদান সাপে(নিজস্ব নিয়মে চলত। অবশ্য বর্তমান মুর্শিদাবাদ জেলার অন্তর্ভুক্ত(তখনকার ফতেসিং পরগণার, মনসুরপুরের সৈয়দদের জমিদারী, খোন্দকারদের আইমাদারি ইত্যাদি ১৬৮৫ সালে খাস করে দিয়ে ঔসলি-তুমারি জমার অন্তর্ভুক্ত(করে নূতন জমিদারদের বা নূতন জায়গীরদারদের দেওয়া হয়।

বর্তমান মুর্শিদাবাদ জেলার বিভিন্ন অঞ্চল তখন ঔদুম্বর, মহম্মদাবাদ, শরিফাবাদ, বরবকাবাদ এবং সাতগাঁও সরকারের অন্তর্ভুক্ত(ছিল। এই সরকারগুলি ছিল ২১৯ টি পরগণায় বিভক্ত(। মোট রাজস্ব ছিল ১৮,৭২,৫৭৭ সিক্কা টাকা।

সম্রাট শাহজাহানের আমলে শাহ্সুজা ১৬৫৮ সালে সুবার ১৯টি সরকার ও ৬৮২ টি পরগণাকে ভেঙ্গে ২৪ টি সরকার ও ১৩৫০ টি পরগণা করেন এবং আদায়যোগ্য রাজস্বের পরিমাণ শতকরা ১৫.৫ ভাগ বড়িয়ে দেন।

আরও ব্যাপক পরিবর্তন হয় ১৭২২ সালে সুবাদার মুর্শিদকুলি খাঁর আমলে। ইনিই বাংলা-বিহার-উড়িষ্যার প্রথম নবাব-নাজিম। ইনি রাজধানী ঢাকা থেকে মুকসুদাবাদে স্থানান্তরিত করেন এবং তার নতুন নাম দেন মুর্শিদাবাদ। এই সময় থেকেই এই জেলার ইতিহাস একটি সুস্পষ্ট রূপরেখা নেয়।

ইনি সুবা বাংলাকে ভাগ করেন ১৩ টি চাকলায়। এই চাকলাগুলি প্রশাসনিক বিভাগ হিসাবেও কাজ করত এবং এগুলি পরবর্তী আমলের জেলার ভিত্তি। চাকলাগুলির সাথে সামঞ্জস্য রাখার জন্য পরগণাগুলিকে ঢেলে সাজানো হয়। পরগণাগুলি আর জমিদারীর সাথে অভিন্ন রইল না। একজন জমিদারের অধীনে একটি পরগণা-এই নিয়ম বদলে চাকলাগুলি রাজস্ব আদায়ের জন্য নিম্নভাবে বিভক্ত(করা হ'ল -

ক) এতিমাম - ঔসলি তুমারি জমা বা দেওয়ানি দেওয়া জমিদারী।
খ) মজকুরি - দেওয়ানি দেওয়া বিচ্ছিন্ন জমিদারী।
গ) রাজ - পেশকাশ বা অনিয়মিত অর্থ পাওয়া যেত।
ঘ) জায়গীর।
ঙ) লাখেরাজ বা নানকর - নিষ্কর জমি।
চ) দেবোত্তর, ব্রহ্মোত্তর , পীরোত্তর শ্রেণীর নিষ্কর জমি।

চাকলাগুলির মধ্যে সবচেয়ে বড় ছিল ১১৮ টি পরগণায় বিভক্ত(মুর্শিদাবাদ। অবশ্য চাকলা মুর্শিদাবাদ বর্তমান মুর্শিদাবাদ জেলায় সীমাবদ্ধ ছিল না। বর্তমান রাজশাহী (বাংলাদেশ), বীরভূম, বর্ধমান ও নদীয়া জেলার বিস্তীর্ণ অংশ এই চাকলার অন্তর্ভুক্ত(ছিল। চাকলার মোট রাজস্ব হল ২৯,৯৯,১২৬ সিক্কা টাকা। বৃদ্ধির পরিমাণ ল(্য করবার মতো। সমস্ত সুবায় পরগণার সংখ্যা হ'ল ১৬৬০ । মুর্শিদকুলি খাঁর প্রবর্তিত অবস্থার নাম জমা-উ-কামিল-তুমার।

টোডরমলের সময়ের পরে সুবার, বিশেষ করে মুর্শিদাবাদের, যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি, (দ্রশিল্পের উন্নতি নগরায়ণ ইত্যাদির সাথে রাজস্বও বর্ধিত হয়েছিল। কিন্তু রাজস্বের এই বিপুল বৃদ্ধির প্রধান কারণ যুদ্ধ ও অন্যান্য কারণে মোগল দরবারের ক্র(মবর্ধমান ব্যয়ভার। রাজস্ব বৃদ্ধির এই ধারা পরবর্তী সময়েও অনেকদিন বহাল

ছিল এবং দীর্ঘ মেয়াদে এই প্রবণতা বাংলা অথবা মুর্শিদাবাদের গ্রামীণ অর্থনীতির প(হিতকর হয়নি।

মুর্শিদাবাদের বর্তমান এলাকা প্রধানত রাজশাহী, লস্করপুর, (কু ণপুর, ফতেসিং এবং চুনাখালি জমিদারীর অন্তর্ভুক্ত(হ'ল। বর্তমান লালগোলা, জিয়াগঞ্জ এবং লালবাগ থানার অংশ রাজশাহীর জমিদারের অন্তর্গত ছিল। লস্করপুর ছিল ভাগীরথীর পারে কাশিমবাজারের বিপরীতে। ল(্য করার বিষয় এই সমস্ত জমিদারী মুর্শিদকুলি খাঁর আমলে পুরনো জমিদার বংশের হাত থেকে কেড়ে নিয়ে নূতন জমিদারকে দেওয়া হয়। মুর্শিদকুলি খাঁর সময়ে প্রশাসনের আস্থাভাজন এক নূতন জমিদার শ্রেণীর উদ্ভব হয়।

এই ব্যবস্থা ইংরেজ আমলের প্রথম দিকেও অটুট থাকে। ১৭৬৫ সাল পর্যন্ত রাজস্ব আদায়ের ভার ছিল নবাবের হাতেই। ১৭৬৩ সালে নবাব মীরকাশিম ইংরেজদের সাথে বিরোধের ব্যয়ভারের দায়ে রাজস্বের পরিমাণ অস্বাভাবিকভাবে বাড়িয়ে দেন এবং করভারে জমিদারীগুলি ভেঙ্গে পড়তে আরম্ভ করে।

১৭৬৫সালে সম্রাট ফা(খশিয়ার ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীকে সুবে বাংলার দেওয়ানি দেন। তখন থেকেই বিটিশ ভূমিরাজস্ব প্রশাসনের শু(। দেওয়ানির ভার পেয়ে গভর্নর লর্ড ক্লাইভ দুজন নায়েব দেওয়ান নিযুক্ত(করেন। বাংলায় রেজা খাঁ এবং বিহারে সিতাব রায় । তত্ত্বাবধানে থাকেন কোম্পানীর কলকাতা কাউন্সিল। ১৭৭০ সালে নায়েব দেওয়ান এবং কোম্পানীর কলকাতা কাউন্সিলের মাঝখানে কনট্রোলিং কাউন্সিল অব্ রেভিনিউ নামে একটি সংস্থার সৃষ্টি হয়। এর সদর দপ্তর হয় মুর্শিদাবাদেই। দরবারের রেসিডেন্ট রিচার্ড বীচার হন এই কাউন্সিলের সভাপতি। তার আগের বৎসর আমিল নামে দেশীয় রাজস্ব সংগ্রাহকদের কাজের তদারকি করার জন্য সুপ্রাভাইজার বা সুপারভাইজার নামে একদল কর্মচারী নিযুক্ত(হন। এঁরা নায়েব দেওয়ানের অধীন ছিলেন না, ১৭৭০ সাল পর্যন্ত সরাসরি কলকাতা কাউন্সিল ও ১৭৭০- ৭২ এ কনট্রোলিং কাউন্সিলের অধীন ছিলেন। ১৭৭২ - ৭৪ এ রেসিডেন্ট স্যামুয়েল মিডল্টন সরাসরি মুর্শিদাবাদ চাকলার রাজস্ব সংগ্রহ করতেন। এখানে কোনো পৃথক সুপারভাইজার ছিল না।

প্রথমে রেজা খাঁ জমিদারদের আনুগত্য পাওয়ার জন্য নির্ধারিত রাজস্ব কিছুটা কমিয়ে ছিলেন, যদিও মুর্শিদকুলি খাঁর ধার্য রাজস্বের তুলনায় তখনও তা বেশী ছিল। অচিরেই বোঝা গেল, মীরকাশিমের মতো কোনও ব্রিটিশ বিরোধী নায়কের অভ্যুত্থানের সম্ভাবনা আর নেই। রাজস্ব আবার বাড়তে লাগল। ১৭৬৭ থেকে ১৭৭০ পর্যন্ত তিন বৎসর পর পর খরায় শস্যহানি হল, কিন্তু রাজস্বের দাবি বাড়তেই থাকল। ফলশ্রুতি জমিদারীগুলির ভগ্নদশা এবং ছিয়াত্তরের মন্বন্তর বলে পরিচিত ভয়াবহ দুর্ভি(। এই সময়ের মর্মস্পর্শী বিবরণ পাওয়া যায় বঙ্কিমচন্দ্রের আনন্দমঠ উপন্যাসে।

১৭৭২ সাল পর্যন্ত রেজা খাঁর অরাজক শাসন চলল। তখন ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীও বুঝল একটা কিছু করা দরকার। গভর্নর ওয়ারেন হেস্টিংসের নেতৃত্বে কমিটি অব্ সার্কিট নামে একটি ভ্রাম্যমাণ কমিটি বসল। কমিটির সুপারিশে নায়েব নাজিমের পদ তুলে দেওয়া হ'ল। আরও কিছু পরিবর্তন হ'ল। কানুনগো, আমিল ইত্যাদি দেশী আমলার পদ তুলে দেওয়া হ'ল। ব্রিটিশ আমলাদের (মতা বাড়ানো হ'ল। চাকলা অথবা বড় জমিদারীগুলির এলাকার রাজস্ব আদায়ের জন্য ব্রিটিশ কালেক্টর পদ তৈরী হ'ল। রাজস্ব ব্যবস্থা তদারকির জন্য ফোর্ট উইলিয়ামে তৈরী হ'ল কমিটি অব্ রেভিনিউ। চুনাখালি, লস্করপুর ও (কুণপুরে বসল কালেক্টরের দপ্তর বা কালেক্টরেট। এই কালেক্টররা ছিলেন মুর্শিদাবাদ প্রভিন্সিয়াল কাউন্সিল অব্ রেভিনিউ এর কাছে দায়বদ্ধ। অবস্থার কিন্তু উন্নতি হ'ল না। তখন ঠিক হ'ল জমিদারীগুলি নিলাম ডেকে পাঁচ বৎসরের জন্য বিলি করা হবে। রাজস্ব বাড়ানো ছাড়াও জমিদারেরা কত বেশী রাজস্ব দিতে পারবে তা যাচাই করা এই ব্যবস্থার অন্যতম ল(্য ছিল।

রেজা খাঁ-এর আমলেই রাজস্বের দায়ে জমিদারেরা তাঁদের জমিদারীর অংশ ব্রিটিশের বাণিজ্য সহযোগী এক নূতন বণিক শ্রেণীর কাছে বিত্র(য় করা শু(করেছিলেন। মূলত এঁরাই নিলাম ডেকে জমিদারীগুলি কিনে নিলেন। এদের অনেকেই জমিদারী পরিচালনায় অনভিজ্ঞ ছিলেন। এরা রায়তের করভার বাড়িয়েও প্রতিশ্রুত রাজস্ব আদায়ে ব্যর্থ হলেন। ১৭৭৬ সালে জমিদারদের সাথে বার্ষিক বন্দোবস্ত চালু করা হ'ল । ১৭৮৬ সালে কমিটি অব্ রেভিনিউ এর পরিবর্তে বোর্ড অব্ রেভিনিউ এর সৃষ্টি হ'ল। কালেক্টরদের সহায়তা করতে মফঃস্বল কানুনগোর পদও পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হ'ল। ১৭৯০ পর্যন্ত এই ব্যবস্থা চলল। এই ব্যবস্থাও সফল না হওয়ায় ১৭৯০ সালে জমিদারী দশ বৎসরের জন্য বন্দোবস্ত করার ব্যবস্থা প্রবর্তন হ'ল। এর মাঝে কমিটি অব্ রেভিনিউ -এর পরিবর্তে তৈরী হয়েছে বোর্ড অব্ রেভিনিউ।

১৭৯৩ সালের মার্চ মাসে লর্ড কর্ণওয়ালিস দশসালা বন্দোবস্তকে স্থায়ী বন্দোবস্তে পরিণত করলেন। পার্মানেন্ট সেট্লমেন্ট রেগুলেশন নামে আইন জারি করা হ'ল। এই আইনে জমিদারেরা জমির মালিক বনে গেলেন। ধার্য রাজস্ব চিরস্থায়ী হয়ে গেল। এই রাজস্ব যদি জমিদার সময় মত দিতে পারেন, তবে তাঁর মালিকানা থেকেই যাবে। রায়তেরা সব অধিকার খোওয়ালো। ঠিক এই সময়েই ফরাসী বিপ-বের প্রভাবে ইউরোপের কৃষকেরা সামন্ত শাসন থেকে মুক্ত(হচ্ছিলেন। ইতিহাস কখনও কখনও পরিহাসও করে।

আইনে অবশ্য বলা হ'ল, রায়তদের অধিকার সরকার র(া করবেন। এই বিধান কখনোই কার্যকর হয়নি। 'রায়ত' শব্দটির কোনও

সংজ্ঞা আইনে না থাকায় এবিষয়ে অস্পষ্টতাও ছিল। বরং প্রথম দিকে পঞ্চম এবং সপ্তম নামে পরিচিত নতুন আইনের দ্বারা (১৭৯৯ সালের VIIG নম্বর আইন ও ১৮১২ সালের VG নম্বর আইন) জমিদারদের (মতা দেওয়া হ'ল রাজস্ব বাকি থাকলে রায়তের যে-কোনো সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা এবং রায়তকে গ্রেপ্তার করা। আদালতে রায়তের প্রতিকার পাওয়ার অধিকারও সঙ্কুচিত করা হ'ল। বস্তুত ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্যন্ত রাজস্ব সংত্র(ান্ত সমস্ত আইনের প্রকাশ্য উদ্দেশ্য ছিল রায়তের শ্রম ও দারিদ্রের মূল্যে সরকার এবং তাঁদের জমিদার বন্ধুদের আর্থিক শ্রীবৃদ্ধি।

নূতন জমিদারেরা ছিলেন জমিদারী পরিচালনায় অনভিজ্ঞ ও অনিচ্ছুক। জমিদারী তাঁদের বৃত্তি ছিল না, উদ্বৃত্ত অর্থ বিনিয়োগের উপায় ছিল। আগে থেকেই কিছু কিছু তালুকদার ছিলেন। এঁরা সরকারকে সরাসরি কর দিতেন। এখন জমিদারেরা অনেকেই পত্তনিদারের কাছে জমির উপস্বত্ব অর্পণ করলেন। এই পত্তনিদারেরা খাজনা আদায়ের সম্পূর্ণ ভার পেলেন, জমিদারকে একটি নির্দিষ্ট খাজনা দেওয়ার শর্তে। আবার অনুরূপভাবে পত্তনিদারের অধীনে দরপত্তনিদারদের সৃষ্টি হ'ল। এই ভাবে রায়ত ও জমিদারের মধ্যে বেশ কয়েকটি উপস্বত্বভোগী শ্রেণীর সৃষ্টি হ'ল। ১৮১৯ সালের রেগুলেশনে এই প্রথা আইনগত স্বীকৃতি পেল।

আবার রায়তি জমি যারা কিনতেন, তাঁরাও সবাই চাষ করতেন না। তাঁদের অধীনে সৃষ্টি হ'ল আর একটি স্তর-অধস্তন রায়ত (আনডার রায়ত)। এইসব রায়তেরা খাজনাভোগী মধ্যস্বত্বাধিকারীতে পরিণত হলেন। অনেক আনডার রায়ত আবার অনুরূপভাবে আর এক বা একাধিক আনডার রায়তকে খাজনার শর্তে জমি বিলি করলেন। প্রত্যেক উপস্বত্বভোগীর পাওনা মিটিয়ে সকলের নিচের চাষী - আনডার রায়তের নিজের জন্য অন্ন-বস্ত্রের সংস্থানও রইল না।

খাজনার পর আবার বোঝার উপর শাকের আঁটির মত আবওয়াব, মাঙন, মাথট ইত্যাদি নামে উপরি আদায়ও ছিল। জমিদারের বাড়ির গৃহদেবতার পূজার জন্য, উপনয়ন, বিবাহ, শ্রাদ্ধ ইত্যাদির জন্য নানারকম নিয়মিত ও নৈমিত্তিক আদায় হ'ত। কৃষকের উপর আর্থিক চাপ সহজেই অনুমেয়। নূতন জমিদার শ্রেণীর শ্রীবৃদ্ধির দু-একটি দৃষ্টান্তই যথেষ্ট হবে। কান্দীর গঙ্গাগোবিন্দ সিংহ মাতৃশ্রাদ্ধে ব্যয় করেছিলেন ১৫ ল(টাকা। কান্দীর 'রাজা' গয়া কাশীতে তীর্থ করতে গিয়েছিলেন সাত আটশো অনুচরের সাথে।

অবশেষে ১৮৫৯ সালের রেন্ট অ্যাক্টে এই অসম ব্যবস্থার উৎপীড়ন কিছুটা লাঘব করার চেষ্টা করা হয়, কিন্তু নানা কারণে সে উদ্দেশ্য সাধিত হয় নি। এই সমস্ত কারণে এবং নীলকরদের অত্যাচারের ফলে ১৮৮৫ থেকে ১৮৮০ সাল পর্যন্ত মুর্শিদাবাদ সহ বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলে বারবার প্রজাবিদ্রোহ দেখা দেয়। ফলে ১৮৮৫ সালে এই দুরাবস্থার আংশিক প্রতিকারের জন্য বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ব আইন পাশ হয়।

এই আইন প্রজাদের দুর্দশার লাঘবে কিছুটা সফল হয়েছিল -- তবে তা একবারে নয়। ত্র(মবর্ধমান আন্দোলনের চাপে আইনটি বহুবার -- প্রায় স্বাধীনতার প্রাক্কাল পর্যন্ত সংশোধিত হয়েছে। এইসব সংশোধনীর ও মূল আইনের বিস্তারিত বিবরণ না দিয়ে সং(পে বলা যায় শেষ অবধি আনডার রায়ত পর্যন্ত সর্বস্তরে কিছু কিছু অধিকার স্বীকৃত হয়েছিল। খাজনা বাড়ানো বন্ধ হয়েছিল। খাজনা ছাড়া অন্যান্য আদায় বে-আইনি ঘোষিত হয়েছিল। সর্বস্তরেই প্রজা উচ্ছেদ নিষিদ্ধ বা কঠিন করা হয়েছিল। জমি হস্তান্তরের উপর নিষেধ অনেকাংশেই উঠে গিয়েছিল। বর্গাদার ছাড়া সমস্ত ধরণের চাষীরাই কিছু কিছু সুরাহা পেয়েছিলেন।

কিন্তু বণিক শ্রেণীর হাতে চাষের জমির কেন্দ্রীভবন এবং একাধিক স্তরে করভোগীদের পাওনা মেটাবার দায় থেকে গিয়েছিল। অসন্তোষের আগুনও তাই একবারে নির্বাপিত হয়নি। এর প্রতিবিধানের উপায় নির্ধারণের ভার দেওয়া হয় রয়্যাল এগ্রিকালচার কমিশনকে, যা ফ্লাউড কমিশন নামেই বেশি পরিচিত। এই কমিশনের সুপারিশের একটি ফলশ্রুতি বেঙ্গল টেন্যান্সি অ্যাক্টের কিছু সংশোধন। কিন্তু প্রধান ফলশ্রুতি পশ্চিমবঙ্গ জমিদারী অধিগ্রহণ আইন ও পশ্চিমবঙ্গ ভূমিসংস্কার আইনের প্রবর্তন যাদের প্রধান কাজ মধ্যস্বত্ব বিলোপ, বেশী জমির মালিকদের উদ্বৃত্ত জমি অধিগ্রহণ করে ভূমিহীন চাষীদের মধ্যে বন্টন এবং বর্গাদারদের অধিকারের প্রতিষ্ঠা।

জরিপ ও প্রশাসনিক কাঠামো

চিরস্থায়ী ভূমি-বন্দোবস্ত ব্যবস্থা ছিল মূলত জমিদার শ্রেণীর স্বার্থ র(ায় সচেষ্ট। জমিদার সম্প্রদায় পু(ষানুত্র(মে জমিদারীর মালিক হলেন। জমিদাররা লাভ করলেন মর্যাদা আর পেলেন একটা বৃহৎ ভূ-সম্পত্তি দেখাশোনা করা, হস্তান্তর বা বন্ধকের (মতা। আরও একটা বড় সুবিধাও জমিদারদের দেওয়া হ'ল। সেই সময় জেলাঞ্চলের বেশীর ভাগ জমিতেই চাষআবাদ হ'ত না। এই সমস্ত অনাবাদী জমি সরকার জমিদারদের দিলেন।

বন্দোবস্তের সময় জমির কোন জরিপ হয়নি। জোতের সীমানাও নির্দিষ্ট ছিল না। চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রচলিত হওয়ার পর জেলাঞ্চলের বিভিন্ন জমিদারীর সীমানা সংত্র(ান্ত নির্ভরযোগ্য নক্সা বা ম্যাপ না থাকায় জেলা সমাহর্তা নানা সমস্যার সম্মুখীন হতে থাকেন। এই ব্যবস্থা নিরসনের জন্য ১৮২২ সালের 'দি বেঙ্গল ল্যান্ড রেভিনিউ সেটল্‌মেন্ট রেগুলেশন' অনুযায়ী জেলা সমাহর্তা শ্বেতাঙ্গ কানুনগোদের নিয়ে জমিদারদের সীমানা নির্দেশের জন্য জরিপকার্য আরম্ভ করেন যা ইতিহাসে 'থাক সার্ভে' নামে পরিচিত।

জমিদারদের 'মহাল' বা 'তৌজির' সীমানা সরেজমিনে মাটির 'স্তূপ' বা থাক স্থাপন করে চিহ্নি(ত করা হ'ত বলে এই জমি জরিপ ব্যবস্থাকে 'থাক সার্ভে' বলা হয়। এই জরিপের সময় যে বিবরণ লিপিবদ্ধ করা হয়েছিল তা 'রোয়েদাদ' নামে খ্যাত।

এরপর ১৮৩৩ সালে 'দি বেঙ্গল ল্যান্ড রেভিনিউ সেটল্‌মেন্ট অ্যান্ড ডেপুটি কালেক্টর রেগুলেশন' অনুযায়ী এবং ১৮৩৬ সালে 'দি বেঙ্গল ডিস্ট্রিক্ট রেগুলেশন' অনুযায়ী জেলা সীমানা সংত্র(ান্ত জরিপ কার্যে নবসৃষ্ট 'উপসমাহর্তা' পদাধিকারীদের সহকারী জরিপ অধী(ক করে তাদের তত্ত্বাবধানে ভূমি রাজস্ব সমী(া শু(হয়। এসব জরিপ মূলত 'মহাল' বা জমিদারদের তৌজি থেকে আদায়ীকৃত রাজস্ব নির্ধারণের জন্য হয়েছিল, প্রজাদের জমি-জরিপ বা সীমানা নির্দেশ এই জরিপের উদ্দেশ্য ছিল না। ১৮৪৫ সালে রাজস্ব ব্যবস্থা, দেওয়ানী ও ফৌজদারী কার্য পরিচালনার জন্য এ জেলাকে চারটি মহকুমায় ভাগ করা হয়-বহরমপুর সদর মহকুমা, কান্দী মহকুমা, লালবাগ মহকুমা ও জঙ্গীপুর মহকুমা।

পরবর্তীকালে জেলাঞ্চলে জরিপ কার্যের ব্যাপকতা বৃদ্ধিপায়। মহাল সংত্র(ান্ত জমিদারী বিবাদ ও প্রশাসনিক জটিলতা দেখা দেয়। তখন জেলার ভূমিরাজস্ব, দেওয়ানী ও ফৌজদারী কাঠামোকে আরও মজবুত করার জন্য বৃটিশ সরকার ১৮৭২ সালে 'অবর উপসমাহর্তা' বা সাব-ডেপুটি কালেক্টর পদ-এর সৃষ্টি করে। জরিপকার্য ও ভূমিরাজস্ব সংগ্রহে বিশেষ পারদর্শী ও দ(কানুনগোদের এই নবসৃষ্ট 'অবর উপসমাহর্তা' পদে উন্নীত করবার ব্যবস্থা রাখা হয়। প্রসঙ্গত ১৯৭৪ সালের পশ্চিমবঙ্গ সরকারের অর্থ দপ্তরের ২১৯৬ নম্বর আদেশনামায় এই পদের বিলুপ্তি ঘটে।

১৮৩৬ সালে 'দি বেঙ্গল ডিস্ট্রিক্ট রেগুলেশন' অনুযায়ী মুর্শিদাবাদ জেলাঞ্চলে রাজস্ব সমী(ার কাজ আরম্ভ হয় এবং তা চলে ১৮৭৪ সাল অবধি। এই জরিপকৃত নক্সায় রেভিনিউ সার্ভে নম্বর এবং জরিপভুক্ত(মৌজার জনসংখ্যা, জমির শ্রেণী ইত্যাদি লিপিবদ্ধ করা হয়। সমী(ার একক ছিল 'গ্রাম' বা 'মৌজা'। এই রেভিনিউ সার্ভেতেই প্রথম 'থিওডোলাইট' এর ব্যবহার চালু হয়। রাজস্ব সমী(ার মানচিত্রের নকল এবং আনুষঙ্গিক তথ্যাদি এখনও পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ভূমিলেখ্য- পরিমাপ অধিকারে সুর(িত আছে। জেলা, রাজ্য ও জমিদারী মহালের সীমানা সম্বন্ধে সন্দেহ নিরসনের জন্য এখনও এ মানচিত্র অমূল্য। অবশ্য ১৮৩০ সাল থেকে ১৮৬৭ সাল পর্যন্ত 'গ্রেট ট্রিগনোমেট্রিক সার্ভে 'ও জেলাঞ্চলে চলে। এটি ভূমিরাজস্ব ব্যবস্থায় অত্যন্ত মূল্যবান ও বিজ্ঞানভিত্তিক জরিপ। এই জরিপে স্থাপিত স্তম্ভই পরবর্তী সব জরিপের প্রারম্ভিক নিশানা হিসাবে ধরা হয়। এমন একটি স্তম্ভ ও বেঞ্চমার্ক বহরমপুর ব্যারাক স্কোয়ার সন্নিহিত অঞ্চলে সম্প্রতি চিহ্নি(ত করা হয়েছে।

রেভিনিউ সার্ভেয়ার ক্যাপটেন জি.ই.গ্যাসট্রেলের বিবরণ অনুযায়ী সমগ্র জেলাঞ্চলের আয়তন ছিল ১৬,৮৬,০৫৩.১৬ একর, যার মধ্যে ৯০.৭৮০ একর ছিল ভাগীরথী এবং গঙ্গা প্রবাহিত এলাকা। রেভিনিউ সার্ভে-তে জেলার আয়তন প্রায় ২,৬৩৪.৪৫ বর্গ মাইল রূপে সূচিত হয় এবং ছোট বড় মিলিয়ে ৫৯ টি পরগণা এবং ৩,১২৬ টি গ্রাম, ২,৭২০টি মহাল এবং ১৬৫টি খাস মহালরূপে চিহ্নি(ত হয়। সমগ্র জেলার ভূমিরাজস্ব খাতে আয় ধরা হয় ১২,৯২,৫৭৪ টাকা ৩ আনা ৮ পাই। থানাওয়ারী রাজস্ব ধার্য হয় ৩,৮৬৪ টাকা ৭ আনা ৪ পাই। ১৮৭২ সালে পুনরায় জেলার আয়তন দাঁড়ায় ২৪৬২.৪৪ বর্গ মাইল এবং নিরূপিত রাজস্ব আয় দাঁড়ায় ১৩,৪০,৩৯০ টাকা।

১৮৪৭ সালে 'দি বেঙ্গল অ্যালুভিয়ান এ্যন্ড ডাইলুভিয়ান অ্যাক্ট' এবং ১৮৫৮ সালে 'দি বেঙ্গল অ্যালুভিয়ান ল্যান্ড সেটল্‌মেন্ট অ্যাক্ট' অনুযায়ী ১৮৬২- ৬৩ পর্যন্ত জেলাঞ্চলে বিভিন্ন নদ-নদীর চরে নতুন করে জরিপ করা হয়। এই জরিপই 'দিয়ারা সার্ভে' নামে খ্যাত। সার্ভেয়ার জেনারেল মেজর জেমস্ রেণেলের সার্ভের পর জেলার বহু প্রধান নদীপথের গতি পরিবর্তিত হওয়ায় জেলাঞ্চলে এই জরিপের প্রয়োজন দেখা দেয়। 'দিয়ারা সার্ভে' চলাকালীন জরিপের নিয়ম এবং নির্দেশাদি প্রণয়ন করে লর্ড নর্থব্রুক -এর সময় ১৮৭৫ সালে 'দি বেঙ্গল সার্ভে অ্যাক্ট' চালু হয়। ঐ সময় মুর্শিদাবাদ রাজশাহী বিভাগের অন্তর্গত এবং জেলা সদর বহরমপুর ছিল সমগ্র রাজশাহী বিভাগের সদর দপ্তর। ১৮৭৫ সালের ১০ই নভেম্বর থেকে এই জেলাকে 'প্রেসিডেন্সি' বিভাগের সঙ্গে জুড়ে দেওয়া হয় এবং বহরমপুর সদর থেকে রাজশাহী বিভাগের সদর দপ্তর স্থানান্তরিত হয় রাজশাহীতে। ১৮৭৫ সালেই ১৭০ টি গ্রাম মুর্শিদাবাদ থেকে বীরভূম জেলার সঙ্গে যুক্ত(হয়। ১৮৭৬ সালে 'দি ল্যান্ড রেজিস্ট্রেশন অ্যাক্ট' চালু হওয়ার ফলে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে পাওয়া জমিদারী মহালগুলো জমিদার-ইজারাদার-পত্তনীদার ইত্যাদি মধ্যাস্বত্বাধিকারী জেলা সমাহর্তার করণে রেজিষ্ট্রি করান। এসময় জেলায় একজন 'উপ-সমাহর্তা'কে তৌজি-সমাহর্তা নিযুক্ত(করে জমিদারদের মহালগুলো স্থায়ীভাবে নথিবদ্ধ করা হয় এবং পরবর্তীকালে 'মৌজা', 'তৌজি' সংত্র(ান্ত বিবরণ ও সূত্র সেখান থেকে সংগৃহীত হয়।

পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছিল যে, চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে মুর্শিদাবাদ জেলাঞ্চলে বিদেশী শোষকবৃন্দ এবং তাদের অধিকতর হৃদয়হীন দেশীয় সহযোগী ভূ-স্বামীদের নজিরবিহীন অত্যাচারে এই জেলার গ্রামীণ মানুষ চরম দুর্দশার সম্মুখীন হয়েছিল। জেলার জনজীবন বারে বারে পীড়িত বিপর্যস্ত ও বিধ্বস্ত হয়েছিল। ডব্লিউ.ডব্লিউ. হান্টার তাঁর 'এ স্ট্যাটিসটিক্যাল অ্যাকাউন্ট অব্ বেঙ্গল' গ্রন্থের নবম খণ্ডে তৎকালীন ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের

সহযোগিতায় তথ্যানুসন্ধান করে লিখেছেন, ১৮৭০-৭২ সালে ইজারার সংখ্যা ছিল ১৪০২, ১৮৭৬ সালে তা দাঁড়ায় ২৫২১ এবং ১৮৭৯-৮১ সালে তা ৪১৬৯ হয়। কিন্তু পরে আবার হ্রাস পায়, তাই ১৮৯৭-৯৯ এ জেলায় ইজারার সংখ্যা দাঁড়ায় ১৫৮৩ তে। ইজারাদাররাই 'ভুইফোঁড় মধ্যাস্বত্বাধিকারী শ্রেণী', 'জমিতে যাদের ঠেকে না চরণ, জমির মালিক তারাই হন।' এদের অধীনে জোতের সংখ্যার যে বিবরণ পাওয়া যায় তা নিম্নরূপ -

বার্ষিক খাজনার পরিমাণ	অধীন জোতের শতাংশ
১০০ টাকার উপরে	০.১৬
৫০-১০০ টাকা	০.৭৯
২০-৫০ টাকা	৫.৫৬
৫-২০ টাকা	২৬.৩৪
৫ টাকার নীচে	৬৭.১৫

তবুও জেলার ৬৭.১৫ শতাংশ (ুদ্র জোতের মালিক / রায়ত যাদের খাজনা ছিল ৫ টাকা, তারা যথাসময়ে তাও দিতে পারত না কারণ খাজনা ছাড়া আরও বাড়তি বহু বেআইনি কর বা অবৈধ উৎকোচ গোমস্তা-নায়েবদের দিতে তাদের বাধ্য করা হ'ত। ১৮৫৭ সালে ঘটে যাওয়া মহাবিদ্রোহের ফলে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর শাসনের ভিত্তিমূল নড়ে ওঠে। ফলস্বরূপ কোম্পানীর শাসনের অবসান ঘটিয়ে সরাসরি ভারতের শাসন ব্যবস্থা বৃটিশ সরকার দ্বারা গ্রহণের উদ্দেশ্যে একটি বিল পার্লামেন্টে উত্থাপিত হয় এবং ১৮৫৮ সালের ২রা আগস্ট 'ভারত শাসন আইন' পাশ হয়। ইংল্যান্ডের মহারাণী 'ভিক্টোরিয়া' ভারতের শাসনভার সরাসরি গ্রহণ করেন।

১৮৫৯ সালে প্রজাদের অসন্তোষ নিরসনার্থে 'রেন্ট অ্যাক্ট,-১৮৫৯'বা 'খাজনা আইন' পাশ হলেও, জেলার কৃষক-রায়তদের অবস্থার কোন উন্নতি হয়নি। জমিদারদের অত্যাচার অব্যাহত থাকে। জমিদাররা নির্দিষ্ট খাজনা ছাড়াও বিভিন্ন আবওয়াব, উৎকোচ ইত্যাদি গ্রহণ করতেন এবং খাজনা দিতে না পারার কারণে প্রজাদের বা রায়তদের যখন তখন উচ্ছেদ করতে পারতেন। কিন্তু খাজনা আইনে রায়ত বা প্রজাদের দুই একটি বিশেষ সুবিধার কথা ইংরেজ সরকার ঘোষণা করলেন। এই আইন জেলার গ্রামাঞ্চলের ছোট ছোট জোতের রায়তদের একাদিত্র(মে বার বছরের দখল থেকে দখলী স্বত্বের স্বীকৃতি দেয় এবং ঘোষণা হয় যে প্রজাদের খাজনা উপযুক্ত(ও ন্যায়সঙ্গত হতে হবে। জমির পরিমাণ বাড়লে, শস্যের মূল্য বৃদ্ধি হলে অথবা কোন একটি রায়তের খাজনা প্রচলিত খাজনার হারে কম হলে জমিদারের খাজনা বৃদ্ধির অধিকার থাকবে। অপরদিকে চাষের জমির পরিমাণ হ্রাস পেলে বা শস্যের মূল্যের হ্রাস ঘটলে খাজনা কমানোর ব্যবস্থাও স্বীকৃত হয়। খাজনা না দেওয়ার কারণে উচ্ছেদের ব্যবস্থা একমাত্র দেওয়ানী আদালতেই স্থিরীকৃত হবে। জমিদার-নায়েব-গোমস্তাদের দাপট ও অধিকার খর্ব করা হয়।

বস্তুত ইংরেজ সরকার শাসনভার গ্রহণ করার পর থেকেই চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রাপ্ত জমিদার-প্রজার সম্পর্ককে নূতনভাবে দেখবার চেষ্টা করা হয়। ১৮৭৯ সালে বৃটিশরাজ কর্তৃক 'দি বেঙ্গল ল্যান্ড ডিসপিউট এ্যান্ড রেন্ট সেটল্‌মেন্ট অ্যাক্ট' চালু হয়। ইংরেজরা বুঝতে পারে প্রচলিত জমি ব্যবস্থায় গলদ আছে এবং জমি ও কৃষি সম্বন্ধে সঠিক তথ্য না থাকায় তথ্যানুসন্ধানের জন্য ১৮৮৩ সালের ১লা জানুয়ারী ডিরেক্টর অব্ ল্যান্ড রেকর্ডস্ এ্যান্ড এগ্রিকালচার নামে একটি দপ্তর খোলা হয়। আর এই ব্যাপারে প্রজাদের সঠিক অবস্থা নির্ণয় করার জন্য সরকার ভূমি স্বত্বলিপি লিখনের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে। এর অব্যবহিত ফল ১৮৮৫ সালের বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ব আইন প্রবর্তন।

এই আইনে বলা হয় রায়ত বা প্রজা নিজে অথবা উত্তরাধিকারের মাধ্যমে একাদিত্র(মে বার বছর কোন জমি দখল করলে, সে সেই জমির স্থায়ী প্রজা বা রায়ত রূপে গণ্য হবে। তাঁর দখলে যে জমি আছে তাতে তাঁর দখলীস্বত্ব থাকবে এবং চাষের জন্য কোন নতুন জমি নিলে তাতেও তাঁর অধিকার থাকবে। দখলি জোতকে হস্তান্তরযোগ্য করার প্রস্তাবও ভারত সরকার গ্রহণ করে। খাজনা বৃদ্ধির অনুমোদিত কারণের সঙ্গে আরও দুটি কারণ যুক্ত(হয়। যথা- ১) জমিদার কর্তৃক জমির উৎপাদিকা শক্তি(বাড়ানোর জন্য জমির উন্নতি ঘটা এবং ২) নদী সংত্র(ান্ত ও সেচন সংত্র(ান্ত কোন কারণে জমির উৎপাদিকা শক্তি(বেড়ে যাওয়া। যাই হোক ১৮৮৫ সালের বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ব আইনে পূর্বেকার আইনগুলোর ত্রুটিবিচ্যুতি দূর করার জন্য প্রবণতা দেখা যায়। বস্তুত এই আইনে খাজনা বৃদ্ধির একটি সুনির্দিষ্ট পদ্ধতি নির্ধারণ করার প্রচেষ্টা নেওয়া হয় যাতে জমিদারের অযথা খাজনা বৃদ্ধি করবার প্রবণতাকে নিয়ন্ত্রণ করা হয়, বাকী খাজনার দায়ে জমিদারদের প(রায়তের সম্পত্তি ত্রে(াক করা অধিকতর শক্ত(হয় এবং আদালতের ডিত্র(ী ব্যতীত রায়ত বা প্রজা উচ্ছেদ বন্ধ হয়। দখলীস্বত্ব যুক্ত(রায়তের সংজ্ঞার সম্প্রসারণ ঘটানো হয়, যাতে রায়তদের বিপুল অংশই দখলীস্বত্ব যুক্ত(রায়ত হিসাবে স্বীকৃতি পায়, দখলীস্বত্ব যুক্ত(রায়তেরা জমিদারের অনুমতি ছাড়াই জমি ত্র(য়-বিত্র(য়ের অধিকার লাভ করে, ফলে দখলীস্বত্বের কেনা-বেচার বাজার বেশ জেঁকে উঠে, জমির কেন্দ্রীভবন বাড়তে থাকে। রায়তদের থেকে ব্যবসায়ী-পুঁজিপতি মহাজনদের কাছে জমি হস্তান্তরিত হতে শু(করে, প্রথা ও অধিকার-ভিত্তিক নিম্ন রায়ত কোর্ফাদের অস্বিত্ব স্বীকার করে নেওয়া হলেও তাদের স্বার্থর(ার কোন ব্যবস্থা এই আইনে ছিল না।

একথা অস্বীকার করবার উপায় নেই যে, মোগল আমল থেকে ১৮৮৫ সালের আগে পর্যন্ত যে জরিপকার্য কখনও প্রচলিত প্রথা মেনে বা কখনও বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি অনুযায়ী করা হয়েছিল, তা মূলত ছিল জমিদার রাজা-মহারাজা অর্থাৎ ভূমিতে সং(-ষ্ট বিভিন্ন শ্রেণীর অভিজাত সামন্ত প্রভুদের স্বার্থে সংঘটিত। তাই প্রজাদের স্বার্থে জমিজরিপ ও খাজনা নির্ধারণের আইনমাফিক প্রথম পদ(প বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ব আইনে গ্রহণ করা হয়।

এর ঠিক আগে ১৮৮৪ সালের ৩০শে ডিসেম্বর মিঃ এম. ফিনুকেন প্রথম ডিরেক্টর অব্ ল্যান্ড রেকর্ডস অ্যান্ড এগ্রিকালচার রূপে কার্যভার গ্রহণ করেন এবং তার দপ্তরকে বৃটিশ সরকার অনুসন্ধান করতে বলেন - ১) সমগ্র বঙ্গদেশে ঐ সময় কতকগুলি ওয়ার্ড ও খাসমহল কতটা এলাকা জুড়ে (২) এর মধ্যে কতগুলির জরিপ পূর্বে সম্পন্ন হয়েছে এবং কোন মহলের জরিপ পুনরায় করা দরকার(৩) কি পদ্ধতিতে জরিপ ও প্রজাদের স্বত্বলিপির এবং খাজনার হিসাব করা হবে(৪) দপ্তরের কর্মী কারা হবেন এবং জেলাস্তরে এই কার্য কিভাবে সংঘটিত হবে এবং তাদের পরিচালনা নিয়ন্ত্রণ কে করবেন (৫) জেলায় স্থাপিত এই নতুন দপ্তরের ব্যয়ভার কত হবে এবং ঐ ব্যয়ভার কে বহন করবে (৬) ওয়ার্ড এস্টেট মালিকের হাতে ফিরে গেলে জরিপকৃত কাগজপত্রাদি কিভাবে রাখা হবে(৭) বোর্ড অব্ রেভিনিউ-র সঙ্গে এই দপ্তরের সম্পর্কই বা কি হবে, তা প্রতিবেদন আকারে পাঠাতে বলা হয়। বোর্ড অব্ রেভিনিউ তাই ১৮৮৬ সালে ডিরেক্টর অব্ ল্যান্ড রেকর্ডস্ এর সার্বিক নিয়ন্ত্রণে মুর্শিদাবাদ জেলায় ভূ-বাসন আধিকারিক সেটল্‌মেন্ট অফিসারের পদ সৃষ্টি করে সেটল্‌মেন্ট অফিস স্থাপন করে।

এই জেলায় ১৮৮৮ সাল থেকে ভূ-বাসন আধিকারিক এর তত্ত্বাবধানে জমিদার-প্রজার স্বার্থে জমি জরিপ ও স্বত্বলিখনের কাজ শু(করা হয়। দীর্ঘমেয়াদী এই কাজ ডিস্ট্রিক্ট সেটল্‌মেন্ট নামে খ্যাত। এই জরিপে জমির মৌজাওয়ারী দাগভিত্তিক দখলীস্বত্ব প্রণয়ন করা হয় এবং তা চূড়ান্তভাবে ছাপিয়ে প্রজা-জমিদারদের মধ্যে বিতরণ করা হয়। ১৮৯৫ সালে প্রকাশিত দি ল্যান্ড রেকর্ডস মেন্টেন্যান্স অ্যাক্ট অনুযায়ী জেলায় মহাফেজখানা স্থাপিত হয়।

এই জরিপ কার্য পরিচালনার জন্য জেলার 'ভূ-বাসন পরিকাঠামো গঠিত হয়। আধিকারিকদের নবরূপে শ্রেণী বিন্যাস ছাড়াও আমিন, পেশকার, যাঁচমোহরার, সেরেস্তাদার, রেখক (Tracer), নক্‌সাকার(Draftsman), নাজির, নথির(ক, চেনম্যান, প্রসেস সার্ভার, পেয়াদা, দপ্তরী, তহশীল আমলা, নকলবিশ, প্রযুক্তি(উপদেষ্টা ইত্যাদি শ্রেণীর কর্মচারী ভূ-বাসন দপ্তরে সেকালে নিযুক্ত(হয়েছিলেন ভূ-সম্পত্তির নানারকম কাজগুলির সুষ্ঠু রূপায়ণের জন্য।

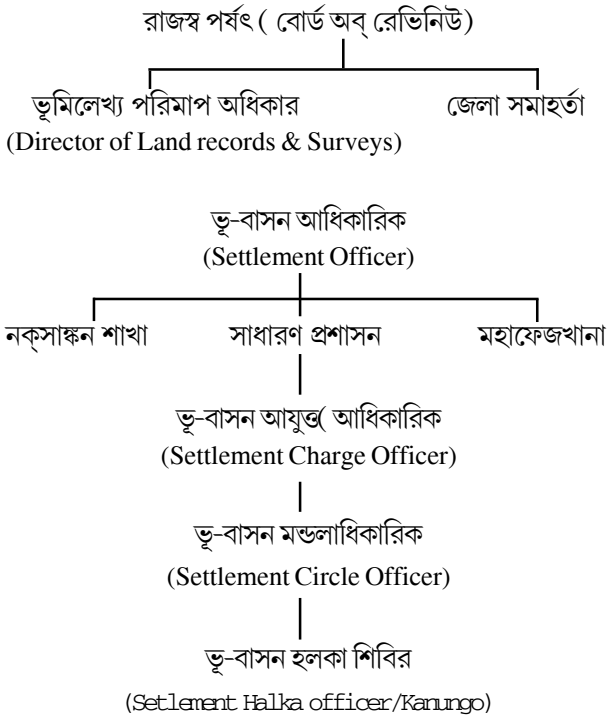

যাইহোক, বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ব আইনানুযায়ী যে জরিপকার্য জেলায় ১৮৮৮ থেকে শু(হয়, তা মূলতঃ ১৯২৪-৩২ সালের মধ্যে শেষ হয়। জেলার সমস্ত মৌজার জরিপকার্য এই সময়সীমার মধ্যে চূড়ান্ত পরিণতি পায়। জমিদার, বিভিন্ন মধ্যস্বত্বাধিকারী এবং রায়ত ও প্রজাদের জমির দখলীকৃত স্বত্বলিপি প্রণয়ন ও মৌজার নক্‌সাও চূড়ান্তভাবে প্রকাশিত হয়। জরিপে সৃষ্ট স্বত্বলিপি থেকে জানা যায় যে, মুর্শিদাবাদ জেলার জমিতে সং(-ষ্ট গ্রামীণ সমাজের মধ্যে কতরকম স্তর বিভাজন প্রত্রি(য়া চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের কুফলে সত্রি(য় ছিল। বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ব আইনে সামগ্রিকভাবে জমিদারদের, বিশেষত ছোট জমিদারদের পূর্বের (মতা অনেকখানি কমে আসে। ফলে মধ্যস্বত্বাধিকারী এবং দখলীস্বত্বভোগী রায়তেরা ত্র(মশ শক্তি(শালী হয়ে ওঠে। বিভিন্ন শ্রেণীর স্তর বিভাজনের ফলে দখলীস্বত্বের রায়তদের অনেকে ধনীচাষী বা জোতদার পর্যায়ে উন্নীত হয়। এদের সংখ্যা বৃদ্ধি পায়। অপরদিকে ছোট ছোট দখলীস্বত্বের (১বিঘা থেকে ৫ বিঘা পর্যন্ত) রায়ত ও স্বত্ববিহীন দখলীকার (কোর্ফা ও ভাগচাষী) নিয়ে গরীব চাষীর বৃদ্ধি ঘটে এবং এই দুই গোষ্ঠীর মাঝে মাঝারী চাষীদের স্বরূপও স্পষ্টতর হয়ে উঠতে থাকে।

এই জেলাতেও জমির কেন্দ্রীভবনের এই ছবি ধরা পড়ে ১৮৮৮ সাল নাগাদ দুটি গ্রামে নিবিড় অনুসন্ধানের ফলে। একটি গ্রামে একটি মাত্র পরিবারের হাতে গ্রামের জমির ২৫ শতাংশ এবং অন্য

দুটি পরিবারের হাতে ১৯ শতাংশ কেন্দ্রীভূত দেখা যায়। সেখানে গ্রামের ৯৫ শতাংশ কৃষক পরিবারের হাতে জমি ছিল গড়ে ২.৫ বিঘা থেকে ৯ বিঘা। অন্যদিকে জেলার অধিকাংশ কৃষকদের পে(ই যেহেতু একটি মাত্র হাল-বলদ রাখা সম্ভব হয়, সেজন্য তাদের এক প্রধান অংশই ১২ থেকে ১৫ বিঘা জমির অধিকারী হয়। রায়তদের মধ্যে এই স্তর বিভাজনের ফলেই ধনী-চাষীদের অনেকে মধ্যস্বত্বভোগী হয়ে উঠতে লাগল, আবার গরীব চাষীদের অনেকেই খাজনার দুঃসহ জ্বালায় অনাবৃষ্টি খরা অজন্মায় জমির স্বত্ব হারিয়ে নিম্নরায়ত/ভাগচাষী বা ে(তমজুরে পরিণত হয়। প্রজাস্বত্ব আইনের ফলে ১৮৮৫ থেকে১৯২০ সালের মধ্যেই এই সকল পরিবর্তনের ফলশ্রুতি সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে।

আলোচ্য পর্বে জেলাঞ্চলে কৃষি-নির্ভর শ্রেণীগুলির জীবন যাত্রার মানের দিকে দৃষ্টিপাত করলে পরস্পর বিরোধী দুই বিপরীত চিত্রের মুখোমুখি হওয়া যায়। জমিদার-মধ্যস্বত্বভোগী-ভূস্বামী এই ত্রি-স্তর পরশ্রমজীবী দেশীয় শোষক এবং খাজনা আদায়ে নিযুক্ত(অসাধু রাজস্ব কর্মচারীদের অত্যধিক উৎকোচ গ্রহণ, জমিদারদের বিলাসবহুল জীবনযাত্রা গ্রামীণ অর্থনীতিকে প্রচণ্ড আঘাত হানে। গ্রামীণ বৃহৎ ভূ-স্বামীদের মধ্যেও নীল ও রেশম কুঠিয়ালদের অনুকরণে ঘরবাড়ী, খাদ্যদ্রব্য, পোষাক, আমোদ-প্রমোদ সমস্ত কিছুর মধ্যেই এক আশ্চর্য ঔপনিবেশিক সাংস্কৃতিক দাসত্বের ছাপ পড়েছিল । মুর্শিদাবাদের সংখ্যাগরিষ্ঠ ছোট চাষী-ভাগচাষী-ে(তমজুরদের ত্রিস্তরযুক্ত(শ্রমজীবী শ্রেণীটির জীবনযাত্রার মান ছিল প্রতিবেশী জেলাগুলির চাইতেও যথেষ্ট খারাপ। জেলায় খাদ্যদ্রব্যের উচ্চমূল্য, মজুরীর নিম্নহার, মহাজনের কাছে ঋণবদ্ধতার ফলে ছোটচাষী, ে(তমজুর ও বর্গাদারদের অবস্থা ছিল শোচনীয়। সাহিত্য সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র (যিনি জেলায় ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট ও কালেক্টর হিসাবে কাজ করেছেন) এই জেলাতেই বসেই তাঁর অমরসৃষ্টি 'বঙ্গদেশের কৃষক' প্রবন্ধে ১৮৭১-৭২ সালে ব্যক্তি(গত অভিজ্ঞতা দিয়ে এই শ্রমজীবী কৃষক শ্রেণীভুক্ত(হাসিম সেখ, রামাকৈবর্ত ও পরাণ মণ্ডলের জীবনযাত্রা অবিস্মরণীয় ভাষাচিত্র দিয়ে তুলে ধরেছেন। এই ভূমিব্যবস্থার স্বরূপটি স্বাধীনতা উত্তর যুগেও অব্যাহত থাকে। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে, ১৯৩০-৫০ সাল পর্যন্ত জেলার কৃষি-ব্যবস্থার চিত্র হতাশাজনক । এই পর্বে দ্বিতীয় বি(েযুদ্ধ ও পঞ্চাশের মন্বন্তরের জন্য গ্রামাঞ্চলের মানুষের কৃষিভিত্তিক অর্থনীতি প্রচণ্ডভাবে (তিগ্রস্ত হয়। জমিতে উৎপন্ন ধান-পাটের অস্বাভাবিক মূল্য হ্রাস, খাদ্যশস্যের অভূতপূর্ব মূল্যবৃদ্ধি সর্বোপরি ধান-পাটের দাম সময়বিশেষে পড়ে যাওয়া জেলার ভূমিরাজস্ব ব্যবস্থার তথা কৃষি অর্থনীতির বিপর্যয় ঘটায়। ১৮৫৯ সালের খাজনা আইন ও ১৮৮৫ সালের প্রজাস্বত্ব আইনের মাধ্যমে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ত্রুটিগুলির সংশোধনের সাহায্যে অর্থনৈতিক ব্যবস্থার অপ্রতিরোধ্য ফলশ্রুতি হিসাবে উদ্ভূত সমস্যাবলী মোকাবিলা করা সম্ভবপর হয়নি। বিশেষত ১৯৩০-৫০ পর্বে কৃষিনির্ভর নতুন যে শ্রেণী দুটির আবির্ভাব ঘটেছিল, ভাগচাষী ও ে(তমজুর, তাদের ত্র(মবর্ধমান শোষিত চরিত্রের সঙ্গে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের মত শোষণমূলক একটি ব্যবস্থাকে খাপ খাইয়ে নেওয়া অসম্ভব হয়ে পড়ে। জায়মান এই সংকটের উপলব্ধিই এই জেলাঞ্চলের জমিদার-মধ্যস্বত্ব ভোগীদের খাজনা আদায়ের চরিত্রে গু(ত্বপূর্ণ পরিবর্তন নিয়ে আসতে শু(করে। বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ব আইনের জরিপে শুধু জমির স্বত্বলিপি প্রণয়ণ ও খাজনা নির্ধারণই ছিল ল(্য, ব্যাপক কৃষিজীবী মানুষের স্বার্থে কোনরূপ ভূমিসংস্কার ব্যবস্থার ইঙ্গিত সেখানে অনুপস্থিত। ১৯২৫-৩০ সালের মধ্যে মুর্শিদাবাদ জেলায় মধ্যস্বত্বের জোত-জমার হস্তান্তর (হাজারে)- ১৩.৮৫ শতাংশ। বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ব আইন অনুযায়ী প্রকাশিত স্বত্বলিপি অনুযায়ী ১৯২৪-৩২ সালে জেলায় জমিদার, মধ্যস্বত্বভোগী, রায়ত ও অধীনস্থ রায়তের অধীনে কৃষি জমির অনুপাত এবং ১৯৩০ - ৩৫ সালের মধ্যে জেলায় মধ্যস্বত্ব জোতের ত্রে(তাদের অনুপাত সংত্র(ান্ত তথ্য সারণী-১৬.১ ও সারণী-১৬.২ এ দেওয়া হ'ল।

সারণী -১৬.১

কৃষি জমির স্বত্ব (১৯২৪-৩২)

জমিদার	মধ্যস্বত্বভোগী	রায়ত	অধীনস্থ রায়ত
৪.০৬	১০.৬১	৭৬.৬২	৮.৭১

সারণী -১৬.২

জেলায় মধ্যস্বত্বজোতের ত্রে(তাদের অনুপাত (১৯৩০ - ৩৫)

১।	মহাজন, ব্যবসায়ী ও ঋণদাতা	-	৯.১৫ শতাংশ
২।	জমিদার	-	৩৭.৩২ শতাংশ
৩।	মধ্যস্বত্বভোগী	-	৩.৫৩ শতাংশ
৪।	রায়ত	-	৩১.৬৯ শতাংশ
৫।	ভাগচাষী ও কোর্ফা শ্রেণীর অন্যান্যরা	-	১৮.৩১ শতাংশ

সুতরাং উপরিক্ত(সারণীগুলি থেকে দেখা যাচ্ছে যে, ১৮৮৫ থেকে ১৯৩০ সাল পর্যন্ত একদিকে জমিদার ও মধ্যস্বত্বভোগীদের খাসখামার, মধ্যস্বত্বজোত ও রায়তিজোতের পরিমাণ বেড়ে চলেছে অন্যদিকে বেড়ে চলেছে ভাগচাষী ও ে(তমজুরদের সংখ্যা । এই পরিপ্রে(তেই ১৯২৮ সালে প্রজাস্বত্ব আইনের সংশোধনের মাধ্যমে বৃটিশ সরকার জেলার ভূমি-সমস্যার সমাধান করতে চাইলেও ভাগচাষী ও ে(তমজুরদের বঞ্চিত করে উদ্বৃত্ত নিষ্কাষণের ত্র(মবর্ধমান

মৌলিক সমস্যা সমাধানের কোন পথই এই সংশোধনী আইনে ছিল না। ১৯৩০-৫০ সাল অবধি এই একই ব্যবস্থা জেলাতে কায়েম ছিল।

সারণী - ১৬.৩

স্বত্বাধিকারী রায়তদের জমির অনুপাত (১৯৪০ -৫০)

জমির পরিমাণ	রায়ত পরিবারগুলির অনুপাত
২ একরের কম	৩৮.৩০
২-৩ একর	১০.১০
৩-৪ একর	৯.৩০
৪-৫ একর	৭.৫০
৫-১০ একর	১৬.৯০
১০-৪০ একর	১৭.৯০

সারণী -১৬.৪

কৃষিজীবি রায়ত, ভাগচাষী ও ৎে তমজুরের অনুপাত (শতকরা)

রায়ত নিজে চাষ করেন	৫৮.৯০
ভাগচাষী	২৫.৮০
ৎে ত মজুর	১৫.৩০

সারণী -১৬.৫

(১৯৪৫-৫০ পর্যন্ত)

১।	জেলার ভাগচাষের অধীন জমির শতাংশ -	২৯.০
২।	ভাগচাষী পরিবারের শতাংশ -	৫৬.০

প্রজাস্বত্ব আইনের জরিপে জেলার মহালগুলো থেকে সরকারে দেয় ভূমি রাজস্বের পরিমাণ নির্ধারিত হয় ৪২,০১,৩১৫ টাকা।

স্বাধীনতার পর দেশীয় রাজা, মহারাজা ও বৃটিশরাজ সৃষ্ট ভূমিতে সংৎি-ষ্ট সকল স্তরের মধ্যস্বত্বাধিকারীদের অধিকার খর্ব করে পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা ১৯৫৪ সালে (তিপূরণ দেবার শর্তে সমস্ত রকমের জমিদারী অধিগ্রহণ করে একটি আইন প্রণয়ন করেন। 'জমিদারী অধিগ্রহণ আইন' নামে পরিচিত নামে পরিচিত এই আইনে সকল মধ্যস্বত্বাধিকারী ও জমিদারী প্রথা বিলোপ করে ভূমিকর্ষণকারী প্রজাদের সরকারের অধীনে এনে রায়ত বলে স্বীকৃতি দেওয়া ও সরাসরি তাদের কাছ থেকে ভূমিরাজস্ব সংগ্রহ করা সরকারের মূল ল(্যরূপে সূচিত হ'ল।

এই আইনে জেলার মোট ৭,৬৯,৭৭৩.২৪ একর জমি সরকার অধিগ্রহণ করেছে। এই খাসকৃত জমির মধ্যে কৃষি জমির পরিমাণ ৩৭২৬৫.২০ একর, অকৃষি জমির পরিমাণ -৩৬৫২৫.৭০ একর বন, জঙ্গল ও অন্যান্য জমির পরিমাণ- ৩১৮২.৩৪ একর ।

জেলা সমাহর্তা জেলার সর্বোচ্চ প্রশাসনিক প্রধান। তাঁর অধীনে ভূমিব্যবস্থা পরিচালনার জন্য ১৯৫৪ সাল থেকে একটি নতুন পরিকাঠামো চালু করা হয়।

বোর্ড অব্ রেভিনিউ বা রাজস্ব পর্ষদ

জেলাশাসক ও সমাহর্তা
|
১) অতিরিক্ত(জেলাশাসক ও সমাহর্তা (জমিদারী অধিগ্রহণ)
২) অতিরিক্ত(জেলাশাসক ও সমাহর্তা (ভূমিসংস্কার)
|
ভারপ্রাপ্ত ভূমিসংস্কার আধিকারিক
|
মহকুমা ভূমিসংস্কার আধিকারিক
|
থানা স্তরে - অবর ভূমিসংস্কার আধিকারিক

এই নবসৃষ্ট প্রশাসন ব্যবস্থা, সরকারের প্রাপ্য খাজনা তহশীলদারদের মাধ্যমে রায়তের বা অন্যান্য সংৎি-ষ্ট ভূস্বত্বাধিকারীর কাছ থেকে আদায় করে রাজকোষে জমা দেয় এবং জমিদারী অধিগ্রহণ আইনে সরকারে ন্যস্ত জমির পরিচালনা, ভূমিহীন-কৃষক, ৎে তমজুরদের মধ্যে বন্টন ইত্যাদি কাজ করে।

স্বাধীনতা উত্তর কালে জেলায় জমিদারী অধিগ্রহণ আইনের ৫ম অধ্যায় ও ৭ম অধ্যায়ের ৫৬ ধারা এবং বঙ্গীয় জরিপ আইন অনুযায়ী ১৯৫৪ সাল থেকে নূতন করে ভূ-স্বত্বলিপি ও নক্সা তৈরীর কাজ জেলায় আরম্ভ হয় । এই কাজের জন্য পরিকাঠামো ছিল নিম্নরূপ -

ভূ-বাসন আধিকারিক (Settlement Officer)
|
ভূ-বাসন আযুক্ত(আধিকারিক (Settlement Charge Officer)
|
ভূ-বাসন মন্ডলাধিকারিক(Circle Officer)
|
ভূ-বাসন হলকা শিবির
(রেভিনিউ অফিসার বা কানুনগো দ্বারা পরিচালিত)

জেলায় ১৯৫৫-৫৮ সালের মধ্যে পূর্বেকৃত জরিপের মৌজাভিত্তিক নক্সাগুলো বহাল রেখে ৎে ত্র বিশেষে কিছু কিছু দাগের প্রয়োজনীয় সংশোধনী সহ জেলায় সংশোধনী ভূ-জরিপের কাজ পরিচালিত হয়। এই নূতন জরিপে সমস্ত স্বত্বলিপিতে লিখিত

সরকারের রাজস্ব জেলার জন্য ধার্য হয়, ৪৪,১১,৩৮০ টাকা। ইতিমধ্যে বিধান সভায় ভূমিসংস্কার ব্যবস্থা নূতন করে চালু করবার জন্য 'দি ওয়েস্ট বেঙ্গল ল্যান্ড রিফর্ম অ্যাক্ট -৫৫' নামে আইন চালু হয়। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, সেসময় ভূমি রাজস্ব মন্ত্রী ছিলেন এ জেলার সুসন্তান শ্রী বিমলচন্দ্র সিংহ। এই আইন অনুযায়ী পুনরায় জেলায় ভূ-বাসন আধিকারিকের পরিচালনায় জেলাঞ্চলে প্রতিটি থানায়, মৌজায় নূতন করে নক্সা সংশোধন ও স্বত্বলিখনের কাজ ১৯৭২ সাল থেকে শু(হয়েছে, একাজ এখনও চলছে। এই জরিপে- ১) রায়তদের অধিকার ও দায়দায়িত্ব নির্ণয়, ২) বহুযুগ - উপে(ত ((তমজুর ও ভাগচাষীদের 'বর্গাদার' হিসাবে স্বীকার করে নেওয়া ও তাদের অধিকারকে স্বত্বলিপিভুক্ত(করে সুর(া করা, ৩) কৃষি জমির উর্ধসীমা কমিয়ে তাকে পারিবারভিত্তিক করা, ৪) নূতন করে সরকারের প্রাপ্য ভূমিরাজস্ব নির্ধারণ, ৫) (দ্র ও প্রান্তিক চাষীদের দেয় খাজনা মকুব, ৬) জমিদার, জোতদার ও মধ্যস্বত্বাধিকারীদের লুকিয়ে রাখা জমির অনুসন্ধান করে আইনবলে তা সরকারে ন্যস্তকরণ, ৭) ভূমিহীন মানুষের মধ্যে ঐ জমি বন্টন ও ৮) সর্বোপরি জোতের খন্ডীকরণ রোধে জোতগুলির একত্রীকরণ ও কৃষি সমবায় সমিতি গঠন ইত্যাদির উপর জোর দেওয়া হয়।

এসব কাজ এখনও সম্পূর্ণ হয়নি, চলছে। ইতিমধ্যে ভূমি-প্রশাসন ব্যবস্থায় বর্তমান সরকার এক ব্যাপক পরিবর্তন নিয়ে আসেন। রাজ্য সরকারের ৭ই এপ্রিল, ১৯৮৪সালের ১০২০ (১৮) ই.এস.টি টি. নং বিজ্ঞপ্তি , ২৮শে নভেম্বর, ১৯৮৩ এর ৪২০৫(১৭) ই.এ.টি.টি. নং বিজ্ঞপ্তি এবং ২১শে জুলাই, ১৯৮৮ এর ৭২৭ এল.রেফ. নং বিজ্ঞপ্তি দ্বারা সারা রাজ্যে প্রচলিত দুই প্রশাসন পরিকাঠামোর অবসান ঘটিয়ে নূতন সুসংহত বা অখন্ড ভূমিসংস্কার প্রশাসন চালু করেন। যার পরিকাঠামো নিম্নরূপ -

ভূমি ও ভূমিসংস্কার বিভাগ

ভূমিসংস্কার মহা নির্দেশক

প্রধান সচিব

ভূমিসংস্কার মহাধ্য(

ভূমিলেখ্য ও পরিমাপ অধিকর্তা এবং যুগ্ম ভূমিসংস্কার অধ্য(

জেলা ভূমি ও ভূমিসংস্কার আধিকারিক
তথা অতিরিক্ত(জেলাশাসক ও সমাহর্তা

উপ জেলা ভূমিসংস্কার আধিকারিক

প্রযুক্তি(উপদেষ্টা	বিশেষ রাজস্ব	রাজস্ব আধিকারিক
(১জন)	আধিকারিক (২- ৫জন)	(৩ জন)

মহকুমা ভূমি ও ভূমি সংস্কার আধিকারিক

বিশেষ রাজস্ব আধিকারিক (আইন)	বিশেষ রাজস্ব আধিকারিক (সার্ভে ও সেটেল্‌মেন্ট)

বিশেষ রাজস্ব আধিকারিক
(আহরণ ও ব্যয়ন আধিকারিক)

ব্লক ভূমি ও ভূমি সংস্কার আধিকারিক

১) রাজস্ব আধিকারিক (ভূ-বাসন ও জরিপ)
২) রাজস্ব আধিকারিক (ভূমিসংস্কার ও পরিচালন)
৩) রাজস্ব আধিকারিক (আইন ও আধা বিচার)

রাজস্ব পরিদর্শক (গ্রামপঞ্চায়েত স্তরে)

এই নুতন ভূ-প্রশাসন ব্যবস্থা জেলাস্তর থেকে একদম তৃণমূল পর্যায়ে পঞ্চায়েত ব্যবস্থার কাছে দায়বদ্ধ। পঞ্চয়েতে বসেই এখন রাজস্ব পরিদর্শক গ্রামীণ মানুষের স্বার্থে নক্সা আঁকা, নথি সংশোধন ও অন্যান্য সংস্কারমূলক কাজের দেখাশোনা করেন। অখন্ড ভূমিসংস্কার প্রশাসন কাঠামো সবে শু(হয়েছে, এই মুহূর্তে এর পূর্ণাঙ্গ কাজের বিস্তৃত আলোচনা করা সম্ভব নয়। বস্তুত যত(ণ না অখন্ড ভূমিসংস্কার প্রশাসনের কাজ সম্পূর্ণ হচ্ছে এবং যত(ণ না স্বত্বলিপির চূড়ান্ত প্রকাশন সম্ভব হচ্ছে ততদিন এই নূতন ভূমিসংস্কার প্রশাসন ব্যবস্থার পূর্ণ মূল্যায়নের জন্য আমাদের অপে(া করতেই হবে। এই নুতন অখন্ড ভূমিসংস্কার প্রশাসন ব্যবস্থা তথা কাঠামো যে জনসাধারণের স্বার্থে গণমুখী হয়ে কাজ করবে, সেবিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

ভূমিসংস্কার

স্বাধীনতার প্রাক্কালে পরবর্তী সমস্ত আইনগত সংস্কার স্বত্বেও ১৭৯৩ সালের চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের কিছু অশুভ পরিণাম থেকে গিয়েছিল। প্রথমত, কৃষক এবং সরকারের মাঝখানে বেশ কয়েকটি উপস্বত্বভোগী স্তর ছিল। এই স্তরের স্বত্বভোগীরা উৎপাদনে বিন্দুমাত্র অংশগ্রহণ না করেও কৃষিকর্মের উদ্বৃত্তের সিংহভাগ ভোগ করছিলেন। কৃষকেরা দ্ব্যর্থহীন ভাবে মালিক বলে স্বীকৃত ছিলেন না। এর একটি পরো(ফল জমির উৎপাদনশীলতার ীয়মানতা। ব্রিটিশ আমলে সৃষ্ট মুষ্টিমেয় নব্যধনী সম্প্রদায়ের হাতে ছিল চাষের জমির সিংহভাগ এবং অসংখ্য কৃষক ছিলেন ভূমিহীন বা নামমাত্র জমির মালিক।

বর্গাদারদের (অর্থাৎ যাঁরা ফসলের নির্দিষ্ট অংশ মালিককে দেওয়ার শর্তে অপরের জমি চাষ করেন, তাঁদের) চাষের স্থায়ীত্ব বা বিধিবদ্ধ অধিকার ছিল না। ফসলের দেয় অংশ অনেক ে(ত্রেই অত্যন্ত বেশী ছিল। এই সমস্ত কারণে বহুবার প্রজা আন্দোলন হয়। বর্গাদারদের অধিকার প্রতিষ্ঠার দাবীতে স্বাধীনতা-উত্তর কালে তে-ভাগা আন্দোলন রক্ত((য়ী রূপ নিয়েছে। এর আগে ফ্লাউড কমিশনের রিপোর্টে এ-বিষয়ে বেশ কয়েকটি আইনগত ব্যবস্থার সুপারিশ করা হয়েছিল। এই পরিপ্রে(তে আসে ১৯৫৩ সালের পশ্চিমবঙ্গ জমিদারী অধিগ্রহণ আইন (যা ১৯৫৪ সালে পাশ হয়।) এবং ১৯৫৫ সালের পশ্চিমবঙ্গ ভূমিসংস্কার আইন (যা ১৯৫৬ সালে পাশ হয়।) এই দুই আইনই পরবর্তী কালে কয়েকবার সংশোধিত হয়ে পশ্চিমবঙ্গের ভূমি ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তনে স(ম হয়েছে।

পশ্চিমবঙ্গ ভূমিসংস্কার আইনের বিধান অনুযায়ী ঘোষিত তারিখ থেকে জমিদার ও অন্যান্য মধ্যস্বত্বাধিকারীর সমস্ত উপস্বত্ব ও বাড়তি জমি সরকার গ্রহণ করলেন। তার সঙ্গে গ্রহণ করলেন একটি নির্দিষ্ট সীমার উর্ধে তাঁর সমস্ত উদ্বৃত্ত জমি। এই উর্ধসীমা কৃষি জমির বেলায় ২৫ একর, অকৃষিজমির বেলায় ১৫ একর (কিন্তু অকৃষি ও বাস্তু জমি মিলিয়ে ২০ একর), মাছচাষের জলাশয়ের বেলায় সবটাই। বনভূমির সবটাই সরকার অধিগ্রহণ করলেন। চা-বাগান, কলকারখানা ইত্যাদির ব্যাপারে সরকার প্রতিটি ে(ত্রে আলাদা করে নির্ধারণ করবেন , কতটা জমি দরকার। বাকিটা উদ্বৃত্ত হিসাবে সরকারে ন্যস্ত হবে। খনি জমির বেলায়ও বড় বড় জোত নির্ধারণ ও অধিগ্রহণের বিস্তারিত ব্যবস্থা হ'ল।

অনেক রায়তেরও বড় বড় জোত ছিল এবং তারা অধীনস্থ আনডার -রায়তদের দিয়ে জমি চাষ করাতেন। অনেক আনডার -রায়তের সম্বন্ধেও একই মন্তব্য প্রযোজ্য ছিল অর্থাৎ কার্যত এঁরা চাষী ছিলেন না, উপস্বত্বভোগী ছিলেন। কিন্তু সাংবিধানিক বাধা থাকায় তখন রায়ত বা আনডার -রায়ত সম্বন্ধে জমি অধিকারের আইন প্রযোজ্য হয়নি । ১৯৫৬ সালে সংবিধান সংশোধন করে এই বাধা দূর করা হয়। ঐ বৎসরই পশ্চিমবঙ্গ ভূমি সংস্কার আইনের সংশোধন করে রায়ত এবং আনডার রায়তদেরও মধ্যস্বত্বভোগী বলে ঘোষণা করা হয়।

এইসব কারণে দুটি বিভিন্ন তারিখে উপস্বত্ব ও উদ্বৃত্ত জমির অধিগ্রহণ হয়, জমিদার, পত্তনীদার, দরপত্তনীদার ইত্যাদির জন্য ১৫ই এপ্রিল,১৯৫৫(বাংলা ১লা বৈশাখ,১৩২২) এবং রায়ত ও আনডার রায়তের জন্য ১৪ই এপ্রিল, ১৯৫৬ (বাংলা ১লা বৈশাখ, ১৩৬৩)।

মধ্যস্বত্ব অধিগ্রহণের ফলে রাজস্ব নতুন করে নির্ধারণের প্রয়োজন হ'ল । আগে সরকার জমিদারের কাছ থেকেই রাজস্ব পেতেন, আর জমিদার বা অন্য মধ্যস্বত্বভোগী তার নীচের স্তর থেকে খাজনা আদায় করতেন। এখন মধ্যস্বত্ব লোপ হওয়ার ফলে প্রজারা সরাসরি সরকারের অধীনে এলেন। রায়ত তাঁর উপরের স্তরের মালিককে যে খাজনা দিতেন তাই এখন রাজস্বে পরিণত হ'ল।

পশ্চিমবঙ্গ ভূমিসংস্কার আইনে ভূমি ব্যবস্থা সংস্কারের পথে আরো বেশ কয়েক কদম এগিয়ে গেল। ধাপে ধাপে সংশোধনের ফলে এই আইনের আদিরূপ বেশ কয়েকবার উল্লেখযোগ্যভাবে পরিবর্তিত হয়েছে। সবথেকে গু(ত্বপূর্ণ পরিবর্তনগুলি এসেছে, ১৯৬৮,১৯৭২,১৯৮১, এবং ১৯৮৬ সালের সংশোধনের ফলে। এই ত্র(মবিবর্তনের ইতিহাস কালানুত্র(মিকভাবে বলতে গেলে আলোচনা বহু বিস্তারিত হবে। আইনটির বর্তমান রূপ নিয়েই সং(পে কিছু বলা যেতে পারে।

ক) এই আইনই প্রথম ঘোষণা করল, রায়তই জমির মালিক। সে উত্তরাধিকার এবং হস্তান্তরের অধিকারী।

খ) জমির উর্ধসীমা পারিবারিক ভিত্তিতে নতুন করে নির্ধারিত হল। পরিবারের লোকসংখ্যা অনুযায়ী নতুন উর্ধসীমা হ'ল সেচসেধিত কৃষিজমিতে আড়াই থেকে সাত হেক্টর (মোটামুটি ৮.৬৭ থেকে ১৭.২৯ একর)। অন্য জমির ে(ত্রে এই উর্ধসীমা হ'ল ৩.৫ থেকে ৯.৮ হেক্টর (মোটামুটি ৬.১৭ থেকে ১৭.২৯ একর)। অন্য জমির ে(ত্রে এই উর্ধসীমা হল ৩.৫ থেকে ৯.৮ হেক্টর (মোটামুটি ৮.৬৭ থেকে ২৪.২১ একর)। কোন পরিবারের সদস্যদের মালিকানায় বেশী জমি থাকলে তা সরকারে ন্যস্ত হবে।

গ) তপসিলী উপজাতি সদস্যদের জন্য একগুচ্ছ সুর(ার ব্যবস্থা করা হ'ল। বিশেষ কিছু ে(ত্রে ছাড়া তপসিলী উপজাতির বাইরের কারো কাছে তাঁদের জমির হস্তান্তর নিষিদ্ধ হ'ল। জমি বন্ধকীর পর কিছু বিধিনিষেধ আরোপিত হ'ল এবং দেনার দায়ে বন্ধকী জমি ফেরৎ পাওয়ারও কিছু বিধান প্রণীত হ'ল।

ঘ) বর্গাদারদের অধিকারের ব্যাপারটি আংশিকভাবে সুর(ত করে ১৯৫০ সালেই একটি আইন পাশ হয়েছিল। আলোচ্য আইনে এই সুর(া অনেকটাই এগিয়ে দেওয়া হ'ল। বর্গাদারদের প্রাপ্য ফসলের অংশ নির্দিষ্ট হ'ল। যদি মালিক সার-বীজ ইত্যাদি দেন, বর্গাদার পাবেন ফসলের অর্ধেক। তা নাহলে বর্গাদার ফসলের তিন-চতুর্থাংশ পাবেন। বর্গাদার উচ্ছেদ কতগুলি নির্দিষ্ট বিরল কারণেই হতে পারবে, অন্যথায় তা নিষিদ্ধ। বর্গাস্বত্ব পু(যানুত্র(মিক হল, তবে তা হস্তান্তর যোগ্য হ'ল না।

ঙ) উদ্বৃত্ত ন্যস্ত জমি ভূমিহীন চাষীদের মধ্যে বিলি করার বিস্তারিত বিধি প্রণীত হ'ল।

চ) তথাকথিত ছোট জোতের মালিকদের রাজস্ব দেওয়ার দায় থেকে রেহাই দেওয়া হয়। অন্য মালিকদের দেয় রাজস্ব পুনর্বিন্যস্ত হ'ল।

আইনটির আরও অনেকগুলি দিক আছে। শুধু আর্থ-সামাজিক

(ে ত্রে যে দিকগুলি সবচেয়ে বেশী প্রভাব বিস্তার করেছে, সেগুলিই উপরে উল্লেখিত হ'ল।

গত শতাব্দীর শেষভাগে এই আইনের পরিপূরক আরো কয়েকটি আইন পাশ হয়। এর ফলে দেনার দায়ে বিত্রি(হওয়া জমি ফেরৎ দেওয়ার ব্যবস্থা হ'ল এবং (ে তমজুর এবং সমশ্রেণীর অন্যান্যেরা তাদের বসতের জমির ওপর অধিকার পেলেন।

আলোচিত আইন দুটির পরিপূরক কিছু প্রশাসনিক ব্যবস্থারও উল্লেখ করা যেতে পারে।

ক) বেনামী জমি উদ্ধার - স্বভাবতই বেশী জমির মালিকরা আইনের ফাঁক খুঁজে নানা কৌশলে বহু জমি বেনামীতে লুকিয়ে রেখেছিলেন। গত শতাব্দীর সপ্তম দশক থেকে পঞ্চায়েত ও কৃষক সংগঠনের সহযোগিতায় এই সব জমি উদ্ধার করে বিলি করা হয়।

খ) অপারেশন বর্গা - প্রথম দিকে নানা কারণে বর্গাদারদের নাম স্বত্বলিপিতে লিপিবদ্ধ করে তাঁদের অধিকার প্রতিষ্ঠিত করার কাজ আশানুরূপভাবে অগ্রসর হচ্ছিল না। ১৯৭৮ সাল থেকে রি-ওরিয়েন্টেশন শিবিরের মাধ্যমে এই শ্রেণীর মানুষের ভিতরে তাঁদের অধিকার সম্বন্ধে সচেতনতা আনার ব্যবস্থা করা হয়। গ্রামে সান্ধ্যসভা করে এই শ্রেণীর মানুষের ভিতরে তাঁদের অধিকার সম্বন্ধে সচেতনতা আনার ব্যবস্থা করা হয়। গ্রামে সান্ধ্যসভা করে বর্গাদার হিসাবে নাম নথিভুক্ত(করার জন্য দরখাস্ত আহ্বান করে সরেজমিনে তার ফয়সালা করা হয়। এই পদ্ধতি অপারেশান বর্গা নামে পরিচিত। মুর্শিদাবাদ জেলাতে ও এ ব্যাপারে ব্যাপক কার্যত্র(ম নেওয়া হয়েছিল এবং তাতে উল্লেখযোগ্য সফলতাও মিলেছে।

গ) বর্গাদার ও ছোট চাষীরা মহাজনের কাছে ঋণগ্রস্ত থাকতেন। মহাজনদের প্রভাবে তাঁরা নিজেদের অধিকার দাবী করতে দ্বিধা করতেন, কারণ অনেক(ে ত্রেই জমির মালিকই ছিলেন ঋণদাতা। উল্লেখিত সময়ে ব্যাঙ্ক থেকে বর্গাদার এবং উদ্বৃত্ত ন্যস্ত জমির প্রাপকদের প্রাতিষ্ঠানিক ঋণ দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়। সরকারি ভর্তুকী এই ঋণকে আরও আকর্ষণীয় করে তোলে। অপারেশন বর্গার সফলতার এটিও একটি বড় কারণ।

এই সমস্ত আইনের রূপায়ণের ফলে গ্রামীণ সমাজে যে পরিবর্তন এসেছে, তাকে বৈপ-বিক বললে অত্যুক্তি(হবে না। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের পর থেকে গ্রামীণ জীবন জমিদারী প্রথাকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হচ্ছিল। পরবর্তীকালে বড় জমির মালিকেরাও যথেষ্ট প্রভাবশালী হয়ে উঠেছিলেন। মুর্শিদাবাদ জেলার (ে ত্রে কান্দী, রাজশাহী , লালগোলা ইত্যাদি অঞ্চলের বড় জমিদারীর প্রবল প্রতাপ ছিল । এই আইন দুটির প্রয়োগের ফলে এই কাঠামো সম্পূর্ণ ভেঙে গিয়েছে এবং নূতন নেতৃত্ব আবির্ভুত হয়েছে। একথা মনে করবারও কারণ আছে যে বড় জোতগুলি ভেঙে ছোট চাষীদের মধ্যে বাঁটোয়ারা হওয়ায় জমির উৎপাদশীলতা বেড়েছে এবং গ্রামীণ অর্থনীতির উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন হয়েছে।

ভূমি-সংস্কারের কাজে মুর্শিদাবাদ

জেলার ভূমি ব্যবস্থা সম্পর্কে বলতে গেলে জেলার প্রাক্তন জেলাশাসক শ্রী অশোক মিত্রের অবদান আলাদা করে উল্লেখের দাবী রাখে। শ্রী মিত্র জেলায় তেভাগা আইন চালু করার উদ্দেশ্যে নবগ্রাম ও সাগরদীঘি থানার প্রত্যন্ত গ্রামগুলি পরিদর্শনকালে সেখানকার হতদরিদ্র চাষীদের অবস্থা সম্পর্কে জ্ঞাত হ'ন এবং ভূস্বামীদের প্রজাশোষণের নানা ঘটনা শুনে তার প্রতিকার করার ল(্যে থানা দুটির প্রত্যন্ত এলাকাগুলিতে শিবির স্থাপন করে ঋণ সালিশীর কাজ শু(করেন।

ঋণসালিশীর কাজের জন্য শ্রী মিত্র ব্যক্তি(গত উদ্যোগে কিছু প্রাক্তন ঋণ সালিশী অফিসারদের শিবিরে এনে রাখেন। তাঁদের কাজ ছিল আবেদনপত্র গ্রহণ করে, নথিপত্র দেখে, সা(ীদের দেওয়া সা(্য লিপিবদ্ধ করে সেখানেই রায় দেওয়া এবং পুলিশ দিয়ে সেই রায় কার্যকর করা। শিবির সংঘটিত হয়েছিল ফসল কাটার মরসুমে। অফিসারদের কাজ ছিল কাটা ফসল ভাগ করে, অর্ধেক ভাগ চাষীকে দিয়ে জমিদার বা ভূস্বামীর কাছ থেকে তার রসিদ নিয়ে সেই রসিদের ভিত্তিতে জমির সেট্‌লমেন্ট খতিয়ান ভাগচাষীদের নামে রেকর্ড করা। শ্রী মিত্রের প্রত্য(তত্ত্বাবধানে এই কাজে অভাবিত সাফল্য আসে।

শ্রী মিত্রের আরেকটি বড় সাফল্য ঐ সব এলাকার ঋণ সালিশী বোর্ডের বকেয়া কাজ শেষ করা। ভূস্বামীদের শোষণ চিত্র কতটা অমানবিক ছিল তার বিবরণ পাওয়া যায় শ্রী মিত্রের আত্মজীবনী 'তিন কুড়ি দশ'-এ। ১৯২২ সালে জমি বন্ধক রেখে নেওয়া দু'টাকা ধার ১৯৪৯ সালের নভেম্বর মাসে সুদ আসলে চার হাজার টাকা দাঁড়ায়। ঋণগ্রহীতারা এভাবেই পরিণত হ'ত ভূমিদাসে। একবার কোন কাজে ঋণ নিলে সেই ঋণ শোধ দেবার (মতা হ'ত না দরিদ্র প্রজার। বংশানুত্র(মিকভাবে সে স্ত্রীপুত্র সহ ঋণ শোধের জন্য নিজের জমিতেই বেগার খেটে যেত। লাভের ফসল ঘরে তুলতেন ঋণদাতা ভূস্বামী বা মহাজন।

বঙ্গীয় কৃষিঋণ আইনের বিধান অনুযায়ী ঋণ সালিশী বোর্ডের উপর নির্দেশ ছিল যে, সমস্ত ঋণের সুদ হিসাব হবে সরল সুদের হারে। যা এতদিন চত্র(বৃদ্ধি হারে হয়ে আসছিল তা সরল সুদে পরিণত হওয়ায় সরকারী কাজ সহজ হয়ে যায়। এর সঙ্গে বের করা হয় জমির উপস্বত্বের পরিমাণ। যে কবছর মহাজন বা ভূস্বামী জমি ভোগ করেছেন সেই কয় বছরে ফসলের মোট পরিমাণ, তার বাজার দর নির্ণয় করে মহাজন বা ভূস্বামীর উপস্বত্ব ভোগের পরিমাণ নির্ণয় করা হয়। এই পরিমাণটি হ'ল খাতকের শোধের পরিমাণ। এই অঙ্ক

থেকে ঋণ গ্রহীতার নেওয়া আসল ও তার সুদের যোগফল বাদ দিয়ে বের করা হ'ত জমিদার বেআইনীভাবে কত টাকা আদায় করেছেন তার পরিমাণ। জেলাশাসকের আদেশে জমিদার বা মহাজন বিশিষ্ট ব্যক্তি(দের উপস্থিতিতে এই অতিরিক্ত(টাকা ফেরত দিতেন ঋণগ্রহীতাকে। ঊনিশ দিনের শিবিরে শ্রী মিত্রের উপস্থিতিতে এরকম একশ'টি মামলার নিষ্পত্তি করা হয়েছিল। জেলার ভূমি সংস্কার কার্যে অশোক মিত্রের এই অবদান ভোলার নয়।

স্বাধীনোত্তর মুর্শিদাবাদ জেলায় ভূমিসংস্কারের প্রথম পদ(প ছিল বৃটিশ শাসিত ভারতে প্রায় দুশো বছর ধরে চলে আসা চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত সৃষ্ট বিভিন্ন শ্রেণীর জমিদার ও অন্যান্য অধস্তন মধ্যস্বত্বের বিলোপ সাধন। পশ্চিমবঙ্গ জমিদারী অধিগ্রহণ আইন, ১৯৫৩, অনুযায়ী জেলায় ১৯৫৪ সালে থেকেই ছোটবড় বিভিন্ন জমিদারীসহ সকল শ্রেণীর মধ্যস্বত্ব বিলোপ করা হয়। এর পরেও অকৃষি-ভিত্তিক মধ্যস্বত্ব চালু ছিল। তবে তার সংখ্যা অনেক কম ছিল।

আশির দশকে পশ্চিমবঙ্গ ভূমি-সংস্কার আইন, ১৯৫৫ এর ৩(ক) ধারা অনুযায়ী (পশ্চিমবঙ্গ ভূমি-সংস্কার ৩য় সংশোধন আইন, ১৯৮৬) ৯-৯-১৯৮০ থেকে অকৃষি প্রজাদের এবং অকৃষি উপপ্রজাদের উপরোক্ত(স্বত্বাদি রাজ্যে ন্যস্ত হয়েছে। ফলে এখন কৃষি ও অকৃষি উভয় প্রকার জমির সদ্ব্যবহারকারীরা জেলা সমাহর্তার অধীনে রায়তিস্বত্বে ভোগদখলীকার রূপে চিহ্নি(ত হয়েছেন। এখন যে কোন শ্রেণীর জমি নিয়ে কোনও প্রজাস্বত্ব সৃষ্টি সম্পূর্ণ বেআইনী।

১৯৫৩ জমিদারী গ্রহণ আইনে রাজ্যে প্রথম জমির উর্ধসীমা সম্পর্কে বিধান রাখা হয়। আইনটি রূপায়ণের প্রথম পর্যায়ে জেলার বিভিন্ন শ্রেণীর মালিকদের দেওয়া রিটার্নের ভিত্তিতে বেশ কিছু জমি সরকারে ন্যস্ত হয়। কিন্তু পরে দেখা যায় যে, মালিকদের অনেকেই বেনামী হস্তান্তরের মতো বা চেক্‌মুড়ি বন্দোবস্তমূলে নানা কৌশলে প্রচুর জমি বেআইনীভাবে ধরে রেখেছেন। জেলার কৃষক সংগঠন এবং উদ্যোগী স্থানীয় জনসাধারণের সহযোগিতায় ভূমি ও ভূমিসংস্কার প্রশাসন ব্যবস্থায় নিয়োজিত রাজস্ব আধিকারিকগণ অবৈধভাবে ধরে রাখা জমি খুঁজে বের করার জন্য অভিযান চালায়। ফলে জেলায় প্রচুর পরিমাণে জমি সরকারে ন্যস্ত হয়। এই আইনের বিধান অনুসারে উদ্বৃত্ত জমি ন্যস্তকরণের প্রক্রি(য়া এখনও চালু রয়েছে।

ইতিমধ্যে ১৯৫৬ সালেই প্রবর্তিত পশ্চিমবঙ্গ ভূমিসংস্কার আইন, ১৯৫৫ -এর বিধান অনুসারে বাড়তি জমি সনাক্ত(করণ ও ন্যস্তকরণের কাজ চালু হয়। ব্যক্তি(ভিত্তিক কৃষি জমির উর্ধসীমার পরিবর্তন ঘটিয়ে ১৫ই ফেব্রুয়ারী ১৯৭১ থেকে পরিবার ভিত্তিক উর্ধসীমার ব্যবস্থা চালু করা হয়। পরিবার বলতে ১ জন থেকে সর্বোচ্চ নয় জন সদস্য ধরা হয়। সেচসেবিত এলাকায় ১ জন সদস্য বিশিষ্ট পরিবার ১৮.৫২ বিঘা জমি এবং ৯ জন সদস্য বিশিষ্ট সর্বোচ্চ পরিবার ৫১.৮৭ বিঘা রাখতে পারেন। প্রশাসনিক সমী(া করে জানা যায় যে, অনেকেই বেনামী হস্তান্তরের মতো নানান কৌশলে প্রচুর জমি বে-আইনীভাবে ধরে রেখেছে। ৭০ -এর দশকে জেলায় কৃষক সংগঠন আমূল ভূমিসংস্কারের দাবীতে জোরদার আন্দোলন শু(করলে, অবৈধভাবে ধরে রাখা জমি খুঁজে বের করার অভিযান ১৯৭২ সালে চালু হয় এবং এই অভিযান অব্যাহত আছে। ১৯৫৩ এবং ১৯৫৫ সালের আইন অনুসারে উদ্ধৃত্ত লুকানো জমি খুঁজে বের করার ব্যাপারে জেলার পঞ্চায়েত ব্যবস্থা অত্যন্ত কার্যকরী ভূমিকা গ্রহণ করছে। পঞ্চায়েত সদস্যদের এলাকার জমির মালিকানার ধরণের সঙ্গে ঘনিষ্ট সম্পর্ক আছে। ফলে, উর্ধসীমার বাইরে বে-আইনীভাবে রাখা জমি তাঁরা সনাক্ত(করে প্রয়োজনীয় তথ্য ভূমিসংস্কার দপ্তরের সং(-ষ্ট রাজস্ব আধিকারিকের নজরে আনছেন। কারণ, জমির মালিকানা সবসময়ে স্বত্ব লিপিতে নথিভুক্ত(থাকে না। তাই এই সব (ত্রে প্রশাসনকে সবসময়ই বাড়তি তথ্যের উপর নির্ভর করে ন্যস্ত জমি সনাক্ত(করতে হয়। বর্তমানে জেলায় পঞ্চায়েত স্তরে রেভিনিউ ইনস্‌পেক্টর এবং ব্লকস্তরে ব্লক ভূমি ও ভূমিসংস্কার আধিকারিক পঞ্চায়েতের কাছ থেকে প্রাপ্ত তথ্যানুসন্ধান করে উর্ধসীমার অতিরিক্ত(জমি খুঁজে বের করবার সক্রি(য় প্রচেষ্টা অব্যহত রেখেছে।

সারণী -১৬.৬

ভূমিসংস্কারের আইন ১৯৫৫ তে সরকারে ন্যস্ত জমির পরিমাণ

১।	কৃষি জমি - (১৫-২-৭১ থেকে ১৫.৪.২০০০ পর্যন্ত)	১৩৬৪১ একর ৫৭ শতক
২।	অকৃষি জমি -	১৩৪৫ একর ৩৯ শতক
৩।	অন্যান্য শ্রেণীর উদ্বৃত্ত জমি	৫ একর ৪৯ শতক
	সর্বমোট জমি-	১৪৯৯২ একর ৪৫ শতক

আইনি ভূমিসংস্কারের মূল ল(্য হ'ল উর্ধসীমার অতিরিক্ত(বেনামী জমি সরকারের খাস জমি ঘোষণা করে তা দেশের বৃহত্তর ভূমিহীন কৃষিজীবী মানুষের মধ্যে বিলি বন্টন করা। যিনি জমি পাবেন তিনি সেই জমি নিজ হাতে বা পরিবারের সদস্যদের সাহায্যে চাষ করবেন। সেই জমির উপর বাস্তু তৈরী করবেন। অবশ্য কৃষিশ্রমিক, গ্রামীণ কারিগর বা মৎস্য চাষীরাও জমি পেতে পারেন। ভূমিহীন বা সর্বোচ্চ এক একর পর্যন্ত জমির মালিকও একখন্ড খাস জমি পেতে পারেন। ন্যূনতম জমির পরিমাণ কৃষি- ০.৩৩ একর চাষযোগ্য (প্রায় ১ বিঘা পর্যন্ত) অথবা ৫ কাঠা বাস্তু জমি।

মুর্শিদাবাদ জেলায় ভূমিসংস্কার প্রশাসন ও পঞ্চায়েতের উদ্যোগে ১৫.৪.২০০০ পর্যন্ত খাস জমি বন্টন করা হয়েছে -

সারণী - ১৬.৭
বিলিকৃত জমি ও পাট্টা প্রাপক

বিলিকৃত জমির পরিমাণ

১। কৃষি জমি -	৩৫১২৭ একর
২। অকৃষি জমি -	৫৮০৮ একর ৪০ শতক
৩। অন্যান্য জমি-	৭০৮ একর ৬৬ শতক

পাট্টা প্রাপকের খতিয়ান

১। তপঃ উপজাতি (৭৪৪৫ জন) -	২৩৯২ একর ১৭ শতক
২। তপঃ জাতি (২৮৪৬৬ জন) -	৮৩৯২ একর ৩৭ শতক
৩। অন্যান্য (১০৫৫৪৫ জন)-	৩০৫১৫একর ৫২ শতক
৪। স্বামী-স্ত্রী যৌথ (১৫৬৩০ জন)-	৩১১২.০২ একর
৫। পু(ষ (১১৯১৪৬ জন) -	৩৭৩০৬.৮৭৫ একর
৬। স্ত্রী (৬৬৮০ জন) -	১২২৫.১৬৫ একব

বর্গাদারদের নাম নথিভুক্ত(করণ ঃ মুর্শিদাবাদ জেলার গ্রামীণ জনসংখ্যার একটি বড় অংশ জুড়ে আছে বর্গাদারেরা। সুতরাং জেলার গ্রামগুলোর সার্বিক উন্নতির প্র্ে তাই গ্রামীণ বর্গাদারদের আর্থসামাজিক অবস্থার উন্নতির কথা স্বাভাবিক ভাবেই এসে যায়। এককথায় যারা মালিককে উৎপন্ন ফসলের একটি নির্দিষ্ট ভাগ দেওয়ার শর্তে অন্যের জমি চাষ করে, তাদের বলে বর্গাদার বা ভাগচাষী। বিভিন্ন অবস্থায় এই নির্দিষ্ট ভাগ কত হবে তা ভূমিসংস্কার আইন, ১৯৫৫ তে বলে দেওয়া আছে। ভূমিসংস্কার আইন - যেখানে জমির মালিক বা রায়ত বীজ, সার, লাঙল এবং বলদ চাষের জন্য বর্গাদারকে সরবরাহ করবেন, সেখানে উৎপন্ন ফসলের ৫০ভাগ জমির মালিক এবং ৫০ ভাগ বর্গাদার পাবেন(কিন্তু যেখানে বর্গাদার চাষের উ পাদান নিজেই সরবরাহ করবেন, সেখানে বর্গাদার ৭৫ ভাগ এবং জমির মালিক ২৫ ভাগ ফসল পাবেন। ভূমিসংস্কার আইনে বর্গা দারদের চাষের ব্যাপারে যেমন অধিকারের কথা বলা আছে, তেমনি আবার কিছু দায়-দায়িত্বের কথা বলা হয়েছে। অনুরূপভাবে মালিকের কিছু অধিকার ও দায়িত্ব নির্দিষ্ট হয়েছে। বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ব আইনে ভাগীদারদের কথার উল্লেখ ছিল। জমিদারী অধিগ্রহণ আইনে বর্গাদারদের নাম নথিভুক্ত(করবার কথাও বলা হয়েছিল, কিন্তু ভূমিসংস্কার আইনে বর্গাদারদের নাম নথিভুক্ত(করা জমির স্বত্বলিপি প্রস্তুতির অন্যতম প্রধান অঙ্গ হিসাবে বর্ণনা করা হয়েছে। অবশ্য এর পিছনে তে-ভাগা আন্দোলন বা কৃষকদের জোটবদ্ধ শ্রেণী সংগ্রাম অনেকখানি অগ্রণী ভূমিকা নিয়েছিল। তাই ১৯৭২ সালে জেলায় আইন মাফিক ভূমিসংস্কারের যে কর্মযজ্ঞ আরম্ভ হয় এবং এল. আর অপারেশন -এ প্রাথমিক স্বত্বলিপি সংশোধন ও প্রস্তুতিকরনের কাজ আরম্ভ হয়, তাতে বর্গাদারদের নাম নথিভুক্ত(করার প্রচেষ্টা গ্রহণ করা হয়। কিন্তু মালিকের ভয়, সচেতনতার অভাব এবং অন্যান্য কারণে বর্গাদাররা নিজেদের নাম রেকর্ড করার জন্য এগিয়ে আসেননি। কিন্তু ১৯৭৮ সালে স্বত্বলিপিতে বর্গাদারদের নাম বিশেষভাবে নথিভুক্ত(করার উদ্দেশ্য নিয়ে 'অপারেশন বর্গা' নামে একটি বিশেষ কর্মসূচী জেলায় চালু হয়। আইনের বিধিমতে বর্গাদাররা কী কী সুযোগ পেতে পারে তা তাদের বোঝানো এবং নিজেদের নাম নথিভুক্ত(করার জন্য তাদের উৎসাহিত করাই ছিল এই অভিযানের উদ্দেশ্য। তাই জেলাশাসক ও ভূবাসন আধিকারিকের যৌথ প্রচেষ্টায় জেলার গ্রাম-গঞ্জে সরকার নিযুক্ত(রাজস্ব কর্মচারীগণ বর্গাদারদের নাম নথিভুক্ত(করার অভিযানে আন্তরিকভাবে সামিল হন। জেলার পঞ্চায়েত ও কৃষক সমিতিগুলি এই কর্মসূচীর সার্থক রূপায়ণে খুবই গু(ত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এই কাজ অনুষ্ঠিত হওয়ার পর বর্গাদারদের 'বর্গা সার্টিফিকেট' দেওয়া হয় এবং বর্গাদারেরা নিরাপত্তা অনুভব করে ও চাষের বংশানুত্র(মিক অধিকার লাভ করে। সর্বোপরি সরকারী ব্যাঙ্কের স্বল্প সুদে চাষের উন্নতির জন্য বর্গাদারদের ঋণ দানের ব্যবস্থা থাকায় বর্গাদারদের চাষের কাজে উৎসাহ দেখা দেয়। এ সব ব্যবস্থার ফলে চাষের জমির উৎপাদন (মতা স্বাভাবিকভাবেই বৃদ্ধি পেয়েছে। তবে জেলার বিভিন্ন ব্লকে এখনও বেশকিছু বর্গাদারদের নাম নথিভুক্ত(হয়নি। একদা শোষিত হতদরিদ্র কৃষক এখন অর্ধাহারে অনাহারে থাকার পরিবর্তে দুবেলা ভাত খেয়ে পরিবার পরিজন সহ উন্নয়নের পথে অগ্রসর হয়েছে।

সারণী -১৬.৮
নথিভুক্ত(বর্গাদারের সংখ্যা ও জমির পরিমাণ (১৯৯৯ পর্যন্ত)

এল.আর. অপারেশন

সংশোধনের পর	- ২৩৯৬১ জন	২০৩৮২.৭৬ একর
অপারেশন বর্গার পর	- ৫৭৫৬৮ জন	২০৩৮২.৭৬ একর
নথিভুক্ত(বর্গাদার	- ৮৪৮০২ জন	৬৬২৪৯.২৫ একর

এছাড়াও ভূমিসংস্কার আইনে খাসজমিতে যে সব ভূমিহীন বর্গাদার পূর্বতন জমির মালিকের বর্গাদার হিসাবে নিযুক্ত(ছিল, তাদের ভূমিসংস্কার আইনের ১৪(ধ)(৩) ধারা অনুযায়ী রায়ত হিসাবে স্বীকার করে নেওয়া হয়েছে। জেলায় সরকারী খাস জমিতে বর্গাদার যারা রায়তি পেয়েছে তাদের সংখ্যা ৩৩৭ জন এবং জমির পরিমাণ ১২৭.০৭ একর। এছাড়া ভূমিসংস্কার আইন অনুযায়ী ৪৯(১) খ অনুযায়ী ভূমিহীন ে(তমজুর, বর্গাদার বা বসতবাটিহীন চাষীদের বসবাসের উদ্দেশ্যে খাসজমি বাস্তু নির্মাণের জন্য প্রদান করাও

ভূমিসংস্কারের উল্লেখযোগ্য পদ(প। আর এই কাজে ১৫.৪.২০০০ পর্যন্ত সমগ্র জেলার বিভিন্ন অঞ্চলে মোট ৬১০২ জন বসতবাটিহীন (তমজুর চাষীদের মধ্যে ২৩৮ একর ৬ শতক জমি বিলিবন্টন করা হয়েছে। গড় অনুপাত প্রায় জনপিছু ০.০৪ একর বা প্রায় চার শতক।

স্বাধীনোত্তর বাংলার তথা জেলার ভূমিসংস্কার কার্যে ভূমিসংস্কার আইন ব্যতীত আরও অব্যবহিত পূর্বে বা পরে প্রবর্তিত রাজ্য সরকারের আইনুগুলোর উল্লেখ অপ্রাসঙ্গিক নয়। যেমন -১৯৭৫ সালের পশ্চিমবঙ্গ কৃষিশ্রমিক , কারিগর এবং মৎস্যজীবিদের জন্য বসতবাটি জমি অধিগ্রহণ আইন অনুযায়ী জেলায় ব্যাপক কাজ হয়েছে।

সারণী -১৬.৯

স্বত্বলিপি সংশোধনী কাজের অগ্রগতি

১।	মুর্শিদাবাদ জেলার মোট মৌজা	২২৯০ টি
২।	মৌজা ওয়ারী নক্সার সংখ্যা	২২৯০ টি
৩।	নক্সার সীট সংখ্যা	৪১৬২
৪।	জেলার আয়তন ক)	১৩,১৭,১৮৭.২৬৫৫ একর
	খ)	২০৫৮.০৯ বর্গমাইল
৫১ ধারার সংশোধনে		
ক)	খানাপুরী বুঝারত -	২২৯০ টি মৌজায় সম্পূর্ণ
খ)	তস্দিক কার্য -	২২৯০ টি মৌজায় সম্পূর্ণ
গ)	খসড়া প্রকাশন -	২২৮৩ টি মৌজা সম্পূর্ণ
ঘ)	মৌজার চূড়ান্ত প্রকাশনকার্য -	২২৬৪ টি সম্পূর্ণ
ঙ)	মৌজার নক্সার মুদ্রণকার্য -	১২৭৭টি সম্পূণ

জমিদারী ব্যবস্থায় যেসব জলাধার ব্যক্তি(গত মালিকানাধীন ছিল, বর্তমানে সরকার তা অধিগ্রহণ করে খাস করেছে। ৫ একর পর্যন্ত এসব খাস জলাধার র(ণাবে(ণ, পরিচালনার জন্য পঞ্চায়েত প্রতিষ্ঠানের ওপর প্রদান করেছে জেলা ভূমিপ্রশাসন। তবে বৃহৎ খাস মৎস্যাধার, মজে যাওয়া খাল এবং নদী গ্রামাঞ্চলের মৎস্যজীবি প্রাথমিক বা কেন্দ্রীয় সমবায় সমিতির উপর বার্ষিক প্রদেয় রাজস্বের ভিত্তিতে প্রদান করা হচ্ছে। এ পর্যন্ত জেলায় মোট ১৭৫ টি মীনাধার সাময়িক বন্দোবস্ত দেওয়া হয়েছে যাতে মৎস্যজীবি ধীবর সম্প্রদায় নিবিড় মৎস্যচাষে উদ্যোগী ভূমিকা গ্রহণ করতে পারে। এছাড়া সরকারী ফেরিঘাটের এবং খাস হাট-বাজারের পরিচালন ব্যবস্থার পঞ্চায়েতের হাতে দেওয়া হয়েছে। এই কাজগুলিও ভূমি ও ভূমিসংস্কার ব্যবস্থার সঙ্গে যুক্ত(। এছাড়া পূর্ব-পাকিস্তান থেকে আগত উদ্বাস্তুদের মধ্যে বহু অধিগৃহীত জমি পাট্টাপ্রদান করা হয়েছে।

রায়তদের উর্ধসীমার উদ্ধৃত জমি এবং বহরমপুর শহরস্থিত খাস মহলের জমি থেকে সরকারী বিভিন্ন দপ্তরকে কার্যালয় তৈরীর জন্য বিভিন্ন সময়ে দেওয়া হয়েছে। এই জমির পরিমাণ ৫৮৪.১৮ একর খাস জমি এবং ৪৩৯.৯৫ একর অকৃষি জমি।

ভূমিসংস্কারের যে কোনও কর্মসূচী ঠিকমত রূপায়ণ করতে প্রয়োজন হয় হাল তথ্য সংকলিত স্বত্বলিপি বা রেকর্ড। এই রেকর্ড হ'ল জমির মালিকানা বা দখল প্রভৃতি বিষয়ে নথিভুক্ত(তথ্য, জেলায় ব্লকস্তরের রাজস্ব আধিকারিকদের এই রেকর্ড তৈরীর জন্য জমির মালিক, বর্গাদার বা বিভিন্ন শ্রেণীর দখলকারীদের উপরই নির্ভর করতে হয়। হাল তথ্য সংকলিত স্বত্বলিপিই হল ভূমিসংস্কার বা ভূমি ভিত্তিক যে কোনও কার্যকলাপের মূল ভিত্তি। ১৯৭২ সাল থেকে জেলায় নূতন করে পুরাতন স্বত্বলিপি সংশোধনের কাজ ভূমিসংস্কার আইনের ৫১নম্বর ধারা অনুযায়ী আরম্ভ হয়। এই কাজ এখনও চলছে।

বর্তমানে ভূমিসংস্কার খাতে ভূমিব্যবস্থায় প্রান্তিক ও (দ্র মালিকের খাজনা বা রাজস্ব প্রদানে রেহাই দেওয়া হয়েছে। বিশেষত জেলায় যে সকল (দ্র রায়তের সেচ এলাকায় ৪ একর পর্যন্ত জমি আছে, তাদের রাজস্ব থেকে সরকারীভাবে অব্যাহতি দেওয়া হয়েছে। তবে তাদের সেচ বাবদ প্রাপ্য অর্থ সরকারকে দিতে হবে। যে সব রায়তের অসেচ এলাকায় ৬ একর পর্যন্ত জমি আছে তাদেরও রাজস্ব প্রদানে রেহাই দেওয়া হয়েছে। ১৩৮৫ বঙ্গাব্দের ১লা বৈশাখ থেকে এই আইনী পদ(প গ্রহণ করা হয়েছে। কিন্তু রায়তের জমি বা জোতের দখলীকৃত সর্বমোট পরিমাণ যদি দশ একর বা তার বেশী হয় তবে সেই রায়তকে একর প্রতি ২০ টাকা হারে রাজস্ব ও নির্ণীত মোট রাজস্বের ১০ শতাংশ অধিভার প্রদান করতে হবে। এছাড়াও প্রাথমিক শি(াকর, গ্রামীণ কর্মসংস্থান কর, পঞ্চায়েত কর, পথ ও পূর্ত কর ইত্যাদি সেস বাবদ টাকা প্রতি ৮৬ পয়সা দিতে হয়।

১৫.৪.২০০০ পর্যন্ত জমির মালিক / রায়তদের মধ্যে ২,৪২,৭৫৩ জন জেলা-সমাহর্তার কাছে রাজস্বপ্রদানে রেহাই পাবার দরখাস্ত করেছেন। এর মধ্যে ২,৪২,৩২০ টির সরজমিনে তদন্ত ও শুনানী সমাপ্ত হয়েছে। ২,৩৪,৮৮৬ জনকে রাজস্ব প্রদানে রেহাই দেওয়া হয়েছে এবং বাকী ৭৪৩৪ জনকে রেহাই -এ অনুপযুক্ত(করা হয়েছে।

গত ১৬-০৪-২০০০ থেকে ১৫-০৪-২০০১ পর্যন্ত অর্থাৎ ১৪০৭ বঙ্গাব্দের ১লা বৈশাখ থেকে ১৪০৭ বঙ্গাব্দের ৩১শে চৈত্র পর্যন্ত জমির মালিক বা রায়তদের কাছে সংগৃহীত রাজস্বের পরিমাণ ৯০২১৯৮.৬০ টাকা। সেস বাবদ আদায়ীকৃত রাজস্ব পরিমাণ ৭,০৫,২২৬.৪৮ টাকা। সইরাতী এবং আদায়ীকৃত রাজস্ব-১০০০০২৩ টাকা এবং লঘুখনিজ এবং ইঁটভাটা ও টালীভাটার মালিকের কাছে আদায়ীকৃত রাজস্ব - ১,২২,৮৩,৭৯০ টাকা।

তথ্যসূত্র ঃ

১। ডব্লিউ. ডব্লিউ. হান্টার, এ স্ট্যাটিসটিক্যাল অ্যাকাউন্ট অব্ বেঙ্গল, ডি. কে. পাবলিশিং, দিল্লী, ১৯৭৪

২। এল. এস. এস ওম্যালি, বেঙ্গল ডিষ্ট্রিক্ট গেজেটিয়ারস্, মুর্শিদাবাদ, পুনর্মুদ্রণ, ১৯৯৭

৩। বি. কে. ভট্টাচার্য, ওয়েস্ট বেঙ্গল ডিষ্ট্রিক্ট গেজেটিয়ারস্ মুর্শিদাবাদ, ১৯৭৯

৪। অশোক মিত্র, সেন্সাস ১৯৫১, ডিষ্ট্রিক্ট হ্যান্ডবুকস্ মুর্শিদাবাদ

৫। বি. রায়, ডিষ্ট্রিক্ট হ্যান্ডবুক, সেন্সাস, ১৯৬১

৬। সৌম্যেন্দ্র কুমার গুপ্ত, চেনা মুর্শিদাবাদ, অচেনা ইতিবৃত্ত , বহরমপুর ১৯৯৮

৭। দীপংকর চত্র(বর্তী, মুর্শিদাবাদ জেলায় ভূমি-সংস্কার ও গ্রামাঞ্চলের শ্রেণীবিন্যাস, বার্ষিক মুর্শিদাবাদ বী(ণ ১৯৯৩

৮। নীহাররঞ্জন রায়, বাঙ্গালীর ইতিহাস (আদি পর্ব), প্রথম সা(রতা সংস্করণ, ১৯৮০

৯। গৌতম ভদ্র, মুগল যুগের কৃষি অর্থনীতি ও কৃষক বিদ্রোহ, ১৯৮৩

১০। এন.কে. সিনহা, দি ইকোনমিক হিস্ট্রি অব্ বেঙ্গল, প্রথম দ্বিতীয় ও তৃতীয় খন্ড, ১৯৫৬, ১৯৬২, ১৯৭০

১১। খান মহম্মদ মহসীন, এ বেঙ্গল ডিষ্ট্রিক্ট ইন ট্রানজিশান, মুর্শিদাবাদ, ১৭৬৫-১৯৭৯, ঢাকা, ১৯৭৩

১২। সুবোধ কুমার মুখোপাধ্যায়, বাংলার আর্থিক ইতিহাস, ঊনবিংশ শতাব্দী, ১৯৮৭

১৩। বিজয় বিহারী মুখার্জী, ফাইন্যাল রিপোর্ট অন দি সার্ভে অ্যান্ড সেট্লমেন্ট অপারেশনস ইন দি ডিষ্ট্রিক্ট অব্ মুর্শিদাবাদ, ১৯৩৮

১৪ । অনিল চন্দ্র ব্যানার্জী, দি অ্যাগ্রারিয়ান সিস্টেম অব্ বেঙ্গল, প্রথম ও দ্বিতীয় খন্ড, ১৯৮০, ১৯৮১

১৫। ডিরেক্টরেট অব্ ল্যান্ড রেকর্ডস অ্যান্ড সার্ভেস, পশ্চিমবঙ্গ এবং জেলা ভূমি ও ভূমি- সংস্কার আধিকারিক, মুর্শিদাবাদ প্রদত্ত তথ্য।